দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নাগরিক সমাজের দাবী

দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল অঞ্চলের নাগরিকদের সংগঠন 'পানি কমিটি' সুপেয় পানির সংকট নিরসনের জন্য দাবীনামা ঘোষণা করেছে। এই দাবীসমূহ নিম্নরূপ :

১) জাতীয় পানি নীতিমালা ও জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় খাবার পানিতে লবণাক্ততার বিষয়টি বিবেচনায় এনে বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

২) জাতীয় নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন নীতিমালায় লবণাক্ততার বিষয়টি সুনির্দিষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং সে অনুযায়ী প্রকল্প বা কর্মসূচী থাকতে হবে।

৩) বর্তমান জাতীয় নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন নীতিমালা অনুযায়ী লবণাক্ততা আক্রান্ত সুপেয় পানির সংকটাপন্ন প্রত্যেক গ্রামে খাবার পানি সরবরাহের জন্য কমপক্ষে সরকারীভাবে একটি পুকুর খনন করতে হবে।

৪) দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল অঞ্চলে বিরাজমান সুপেয় পানি সংকট নিরসন করে সকলের জন্য নোনামুক্ত সুপেয় খাবার পানির প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে।

৫) মিঠা পানির উৎসগুলো যেন বিনষ্ট না হয় সেদিকে খেয়াল রেখে চিংড়ি ও অন্যান্য নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

৬) কৃষি ও গৃহস্থালী কাজের জন্য মিঠা পানির প্রবাহ ও সরবরাহ বৃদ্ধি করতে হবে।

৭) জলাবদ্ধতা, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং চিংড়ি চাষের ফলে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের নতুন নতুন এলাকা লবণাক্ততায় আক্রান্ত হচ্ছে। এই সমস্যা সমাধানে সরকারীভাবে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৮) জাতীয় পানি নীতিমালা ও জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় এই দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ও অনন্য-সাধারণ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত নেই। এই দুই দলিলেই এ অঞ্চলের স্বতন্ত্র প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৯) দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের যে সকল নদী ও খাল ভরাট হয়ে গেছে সেগুলো পুনঃখনন করতে হবে।

১০) মিঠা পানির মরা নদী ও জলাধারগুলোকে চিংড়ি চাষ ও অবৈধ দখলমুক্ত করে শুধুমাত্র খাবার পানির জন্য ব্যবহার করতে হবে।

উত্তরণ, তালা, সাতক্ষীরা

ফোন : ০৪৭১-৬৪০০৬ এক্স-২৮৩, মোবাইল : ০১৭১-১৮২৩৪৪ ই-মেইল : uttaran@bdonline.com

এই পুস্তিকাটি কেয়ার আরডিসিসি প্রকল্পের সহযোগিতায় কানাডিয়ান আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (সিডা)'র অর্থায়নে প্রকাশিত

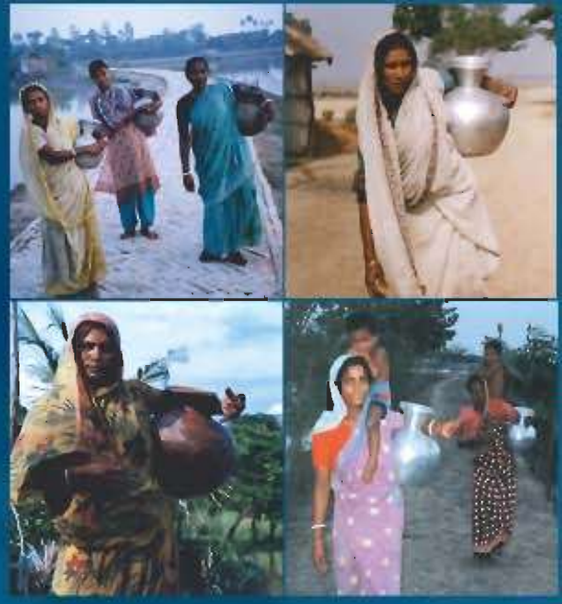

জলবায়ু পরিবর্তন ও লবণাক্ত এলাকা সম্প্রসারণের প্রেক্ষিতে

সুপেয় পানির সন্ধানে

পানি কমিটি

উত্তরণ

সুপেয় পানির সন্ধানে

জলবায়ু পরিবর্তন ও
লবণাক্ত এলাকা সম্প্রসারণের প্রেক্ষিতে

সুপেয় পানির সন্ধানে

জলবায়ু পরিবর্তন ও লবণাক্ত এলাকা সম্প্রসারণের প্রেক্ষিতে

সুপেয় পানির সন্ধানে

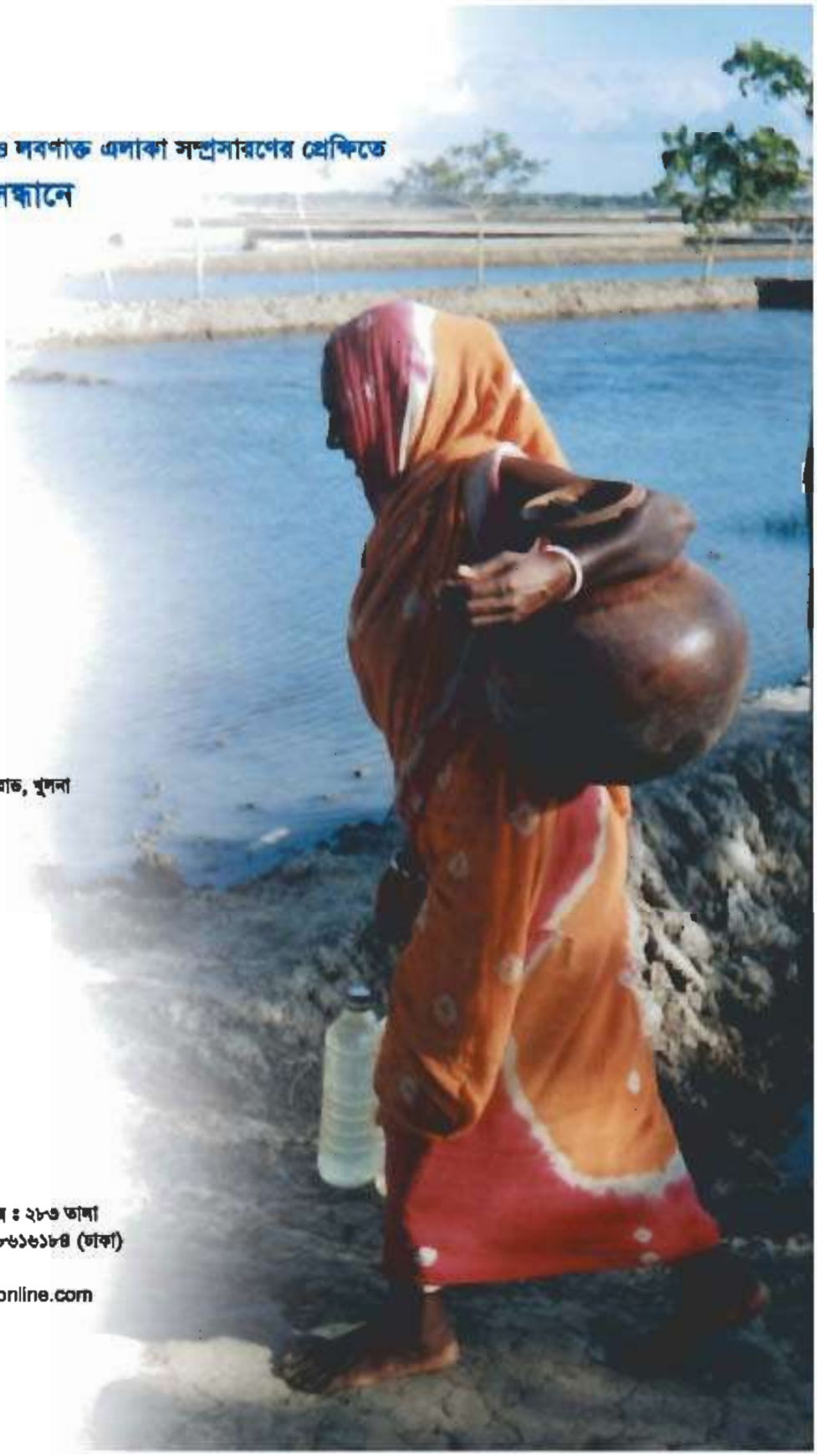

প্রকাশ কাল
জুন ২০০৪

রচনা
শেখ সেলিম আকতার স্বপন
মোঃ মনিরুল মামুন

সম্পাদনা
শহিদুল ইসলাম
এ. কে. এম. মামুনুর রশীদ

প্রচ্ছদ
শেখর বিশ্বাস

গ্রাফিক্স
অংকুর, ৫০ স্যার ইকবাল রোড, খুলনা

মুদ্রণে
প্রচারণী প্রিন্টিং প্রেস
স্যার ইকবাল রোড, খুলনা।
ফোন ঃ ০৪১-৮১০৯৫৭

প্রকাশনায়
উত্তরণ ও পানি কমিটি

যোগাযোগ
উত্তরণ
তালা, সাতক্ষীরা
ফোন ঃ ০৪৭১-৬৪০০৬ এক্স ঃ ২৮৩ তালা
০১৭১-১৮২৩৪৪ (তালা), ৮৬১৬১৮৪ (ঢাকা)
০১৭১-৮২৮৩০৫ (ঢাকা)
ই-মেইল : uttaran@bdonline.com

মুখবন্ধ

দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলবাসীদের সুপেয় পানি সমস্যা নূতন নয়। লবণাক্ত এলাকা সম্প্রসারণের কারণে দিন দিন এ সমস্যা আরও দীর্ঘতর হচ্ছে। এখন এটা স্পষ্ট যে, ভবিষ্যতে সুপেয় পানির সংকট এ অঞ্চলের জনজীবনে মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনবে। বর্তমানে এ অঞ্চলের প্রায় ৫০ লক্ষ মানুষ লবণাক্ততা ও আর্সেনিক আক্রান্ত সুপেয় পানির সমস্যায় জর্জরিত। সমস্যার ব্যাপকতার তুলনায় সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেই বললেই চলে। বাংলাদেশ সরকার জাতীয় পানি নীতি, জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, জাতীয় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন নীতিমালা এবং উপকূল অঞ্চল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা (খসড়া) বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছেন। অথচ লক্ষণীয় যে, এসব নীতিমালার মধ্যে এ অঞ্চলের সুপেয় পানির সমস্যা সমাধানের সুস্পষ্ট কোন পরিকল্পনা নেই।

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা উত্তরণ দীর্ঘদিন এ অঞ্চলে বিরাজমান সুপেয় পানির সমস্যা সম্পর্কিত বিষয়ে কাজ করছে। বর্তমানে এ অঞ্চলের নাগরিকদের সংগঠন 'পানি কমিটি' সুপেয় পানি সংকট নিরসনের দাবীতে আন্দোলন করছে। সে কারণে সমস্যার প্রকৃত চিত্র সকলের কাছে তুলে ধরার প্রত্যয়ে এ প্রকাশনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সমস্যার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের জন্য এ জনপদের বিভিন্ন উপজেলার ভুক্তভোগী নারী-পুরুষদের সাথে পিআরএ ও দলীয় আলোচনা এবং শিক্ষক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, উপজেলা স্বাস্থ্য প্রকৌশলী, ডাক্তার, এনজিও কর্মী, দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও বিভিন্ন পেশাজীবী জনগণের প্রতিনিধিদের নিয়ে অনুষ্ঠিত ৬টি কর্মশালায় এ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তাছাড়া এ অঞ্চলে বসবাসরত নানা স্তরের জনগণ ও 'পানি কমিটি'র নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা এবং বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে এ বিষয়ে মত বিনিময় করা হয়েছে। এ প্রকাশনার একটা বড় অংশে তারই প্রতিফলন ঘটেছে। প্রকাশনার মাধ্যমে যদি দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল অঞ্চলের সুপেয় পানি সংকট ইস্যুটি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয় তাহলেই আমাদের এ উদ্যোগ স্বার্থক হবে।

এ প্রকাশনার জন্য যারা তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং নানাভাবে সহায়তা প্রদান করেছেন সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি বাংলাদেশ ভূ-তত্ত্ব জরিপ-এর উপ-পরিচালক রেশাদ মোহাম্মদ ইকরাম আলীকে; যিনি বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত দিয়ে প্রকাশনাটি সমৃদ্ধ করেছেন। ধন্যবাদ জানাচ্ছি বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ-এর পানি ও পরিবেশ বিভাগের পরিচালক, কেয়ার আরডিসিসি প্রকল্পের পরামর্শক আহসান উদ্দিন আহমেদকে যার পলিসি পর্যালোচনা থেকে পলিসি সম্পর্কিত বেশ কিছু তথ্য নেয়া হয়েছে।

ধন্যবাদান্তে

শহিদুল ইসলাম
পরিচালক
উত্তরণ

অধ্যক্ষ এবিএম শফিকুল ইসলাম
সভাপতি
পানি কমিটি

লবণমুক্ত খাবার পানি সরবরাহের দায়িত্ব কি এই শিশুর না রাষ্ট্রের?

সূচীপত্র

১. ভূমিকা ---------- ০১
২. বাংলাদেশ ও পানি ---------- ০১
৩. বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল ও সুপেয় পানির সংকট ---------- ০৩
ক. মিঠাপানি প্রবাহের বিপর্যয় ---------- ০৩
• গঙ্গা-নদীর গতিমুখ পরিবর্তন
• মাথাভাঙ্গা নদীর উৎসমুখ বন্ধ হয়ে যাওয়া
খ. ষাটের দশকের উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প ---------- ০৫
গ. শুষ্ক মৌসুমে গঙ্গা নদীর প্রবাহ হ্রাস ---------- ০৫
ঘ. সোনাপানির চিংড়ি চাষ ---------- ০৬
ঙ. আর্সেনিক দূষণ ---------- ০৬
চ. ভূ-গর্ভস্থ মিঠাপানির জলাধারের অভাব ---------- ০৬
ছ. ভূমির নিম্নগমন ---------- ০৭
জ. অপরিকল্পিত ভূ-গর্ভস্থ পানির মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার ---------- ০৭
৪. লবণমুক্ত খাবার পানির আপামী সংকট ---------- ০৭
ক. জলবায়ু পরিবর্তন ---------- ০৭
খ. ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প ---------- ০৮
৫. লবণমুক্ত সুপেয় পানির সংকটে বিপর্যস্ত জনজীবন ---------- ১০
৬. সুপেয় পানি সংকট নিরসনে জাতীয় উদ্যোগ ও সীমাবদ্ধতা ---------- ১৩
ক. জাতীয় পানি নীতি ---------- ১৩
খ. জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ---------- ১৫
গ. জাতীয় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন নীতিমালা ---------- ১৭
ঘ. উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা (খসড়া) ---------- ১৭
ঙ. বাস্তবায়িত সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ ---------- ১৮
৭. লবণমুক্ত সুপেয়-পানির সম্ভাব্য উৎস ---------- ১৮
৮. দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল অঞ্চলে সুপেয় পানি সমস্যার স্থায়ী সমাধান ---------- ২৫
৯. দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল অঞ্চলের নাগরিক সমাজের দাবী ---------- ২৫
১০. উপসংহার ---------- ২৬

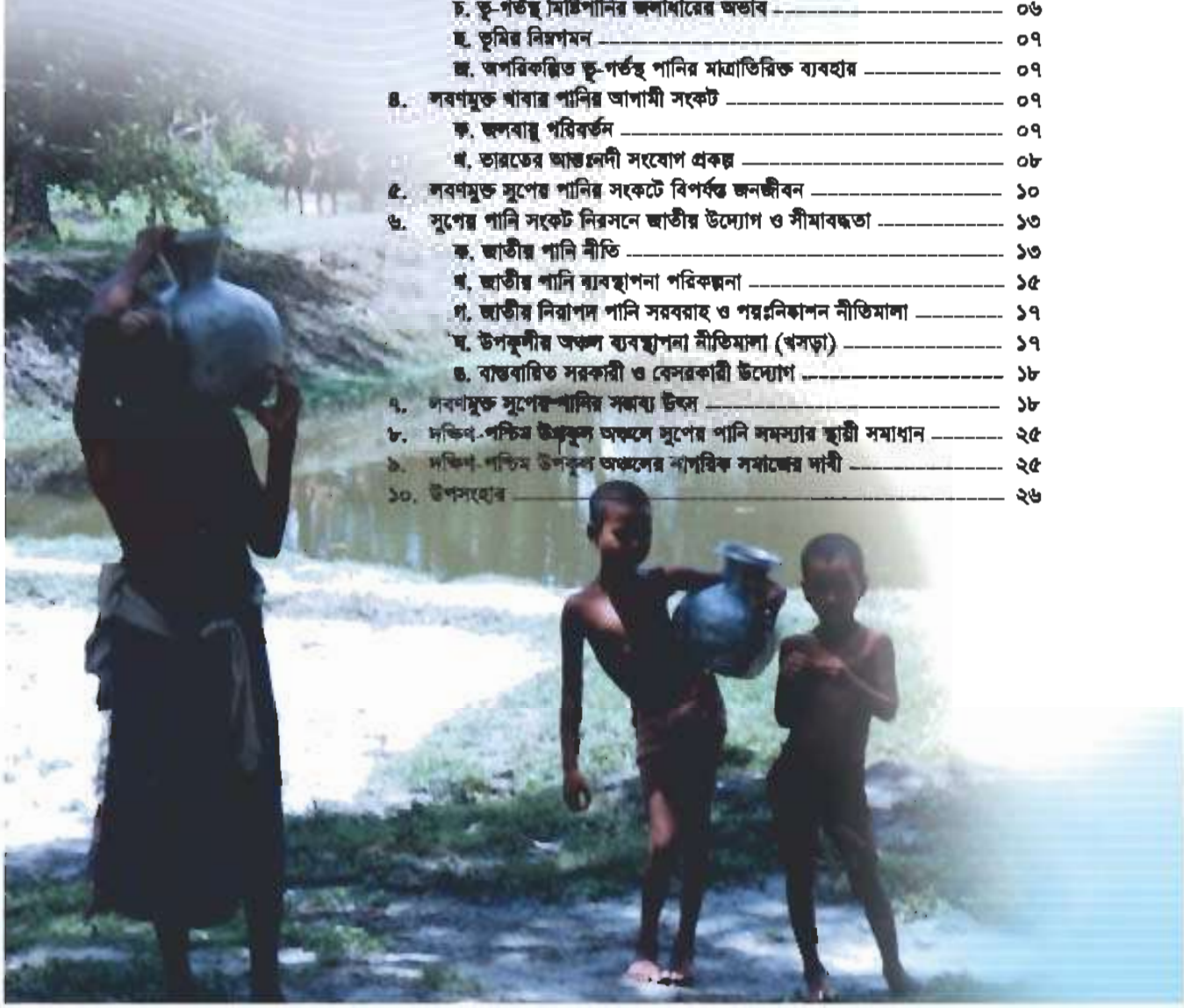

পেট্রোল বা ডিজেল নয়,
সাতক্ষীরা শহর থেকে এভাবে লবণমুক্ত খাবার পানি
নিয়ে যাওয়া হয় সুপেয় পানি সংকটাপন্ন বিভিন্ন গ্রামে।

সুপেয় পানির সন্ধানে

১. ভূমিকা

পৃথিবীর জনসংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে বাড়ছে সুপেয় পানির চাহিদা। সে কারণে প্রাকৃতিক সম্পদ সুপেয় পানি নিয়ে মানুষের চিন্তা ভাবনাও দিন দিন বাড়ছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারে উন্নত জীবন যাপনের প্রয়োজনে মানুষের দৈনিক মাথাপিছু পানির ব্যবহারও প্রতিনিয়ত বাড়ছে; অথচ পৃথিবীর সুপেয় পানির পরিমাণ সীমিত এবং তার উৎসও পৃথিবীর সকল স্থানে সমান অনুপাতে বিস্তৃত নয়। আবার মানুষের বিভিন্নমুখী হস্তক্ষেপের কারণে পৃথিবীর অনেক স্থানে সুপেয় পানির আবার দূষিত বা বিনষ্ট হচ্ছে। তাই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে দেখা দিচ্ছে মানুষের জীবন ধারণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সুপেয় পানির তীব্র সংকট। বর্তমানে পৃথিবীর বিশেষজ্ঞগণ বিষয়টি অতি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করছেন। সুপেয় পানির বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে ২০০৩ সালের বিশ্ব পরিবেশ দিবসে প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ করা হয় 'সুপেয় পানি' এবং বিশ্বব্যাপী পরিবেশ দিবসের শ্লোগান হিসেবে উচ্চারিত হয় "Water–Two Billion People are Dying for It!"

বর্তমান বিশ্বে পানির স্বল্পতা ও দূষণের কারণে মানুষ এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে পাড়ি জমাচ্ছে। পানিবাহিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রতি বছর সমগ্র পৃথিবীতে ৫০ লক্ষ লোক মারা যাচ্ছে। তাছাড়া মিষ্টিপানি দুষ্প্রাপ্যতার কারণে অর্থনৈতিক ও কৃষি উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, বিপর্যস্ত হচ্ছে পরিবেশ ও প্রতিবেশ।

পৃথিবীর পানি সম্পদ অফুরন্ত হলেও সব পানি মানুষের ব্যবহার উপযোগী নয়। পৃথিবীর মোট পানির মাত্র ২.৫ ভাগ মিষ্টিপানি। আবার এ মিষ্টিপানির ৬৮.৯ ভাগের অবস্থান তুষার ও তুষারাবৃত নদীতে, ০.০০৯ ভাগের অবস্থান মিষ্টিপানির লেক ও নদীতে এবং ২৮ ভাগের অবস্থান ভূ-অভ্যন্তরে। মিষ্টিপানির ২৩ ভাগ শিল্পোৎপাদনে, ৬৯ ভাগ কৃষি উৎপাদনে এবং ৮ ভাগ গৃহস্থালী কাজে ব্যবহৃত হয়। বিশ্বের মোট পানি সম্পদের মাত্র ০.০২৫ ভাগ পানি পানযোগ্য। বিভিন্ন কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে এ মিষ্টিপানি দূষিত হচ্ছে। পানিতে আর্সেনিক নাইট্রেট বা ফ্লুরাইডের উপস্থিতি, লবণাক্ততা, শিল্প কারখানার বর্জ্য, শহর-নগরের বর্জ্য এবং সার ও কীটনাশকের কারণে অঞ্চলভেদে হচ্ছে এ পানি দূষণ। ফলে প্রতিনিয়ত সংকুচিত হচ্ছে পানযোগ্য মিষ্টিপানির উৎস। জাতিসংঘের জনসংখ্যা সংক্রান্ত এক হিসেবে বলা হয়েছে, ২০২৫ সালে ৪৮টি দেশে বসবাসকারী ২৮০ কোটিরও বেশী মানুষ পানির অভাবের সম্মুখীন হবে। ২০৫০ সালে এ ধরনের দেশের সংখ্যা দাঁড়াবে ৫৪তে এবং পানির অভাবে থাকা মানুষের সংখ্যা হবে ৪০০ কোটি (পরিবেশ পত্র, বর্ষ ৬, সংখ্যা ৩ ও ৪, ২০০৩)।

২. বাংলাদেশ ও পানি

বাংলাদেশের অবস্থান গঙ্গা (পদ্মা), ব্রহ্মপুত্র (যমুনা) ও মেঘনা এ তিনটি নদী ব্যবস্থার নিম্ন অববাহিকায় এবং এ দেশের নদী প্রবাহের পানির প্রধান উৎস হল গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা। বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত মোট পানির ৯২ শতাংশ পানির উৎস হলো বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্তের বাইরে। উল্লেখ্য বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত ৫৭টি

আন্তর্জাতিক নদীর ৩টি মিয়ানমার থেকে এবং অন্য ৫৪টি নদী ভূটান, নেপাল, চীন ও ভারত থেকে উৎপত্তি হয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে।

বাংলাদেশ মূলতঃ পানি সংক্রান্ত দু'ধরনের সমস্যার সম্মুখীন। বর্ষা মৌসুমে বন্যার কারণে বিস্তীর্ণ জনপদ ও ফসলী জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অন্যদিকে শুষ্ক মৌসুমে দেখা দেয় পানির তীব্র অভাব। বর্ষা মৌসুমের শুরুতে ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা অববাহিকায় এবং বর্ষার শেষ মৌসুমে গঙ্গা অববাহিকায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের ফলে এ সময়ে ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা ও গঙ্গা অঞ্চলে বন্যা দেখা দেয়। তবে উত্তর অববাহিকায় একই সময়ে প্রচুর বৃষ্টিপাত হলে এবং সমুদ্রের জোয়ারের উচ্চতা বেশি থাকলে (ভরা কটাল ও মরা কটাল) এ বন্যা তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ী রূপ নেয় এবং বাংলাদেশের ব্যাপক এলাকা প্লাবিত করে। উদাহরণ স্বরূপ ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশের বন্যার কথা বলা যায়। বাংলাদেশ প্রধান ৩টি নদীর নিম্ন অববাহিকায় অবস্থিত হওয়ার কারণে প্রতি বছর বাংলাদেশের কোন না কোন অঞ্চল বা নদী অববাহিকায় প্লাবন দেখা দেয়।

বাংলাদেশের জন্ম দিয়েছে নদী। একদিকে বন্যায় বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত হয়ে এ দেশের জনজীবনে ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। অন্যদিকে বন্যাবাহিত পলি মাটি জমির উপর অবক্ষেপিত হয়ে জমির উর্বরতা বৃদ্ধিতে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশের ভূমি গঠনে এ সব নদীবাহিত পলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রতি বছর ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা অববাহিকা দিয়ে উজান থেকে আসা ২ বিলিয়ন টন পলি বঙ্গোপসাগরে পতিত হয় যা এদেশের ভূমি গঠনে বিশেষ অবদান রাখে। নিঝুম দ্বীপসহ বাংলাদেশের উপকূল অঞ্চলে জেগে ওঠা চরাঞ্চলগুলো এ পলি দ্বারা গঠিত হয়েছে।

সাধারণত নভেম্বর থেকে মে পর্যন্ত সাত মাস সময়কালকে বাংলাদেশে শুষ্ক মৌসুম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। শুষ্ক মৌসুমে বৃষ্টিপাত খুব কমই হয়। সমীক্ষায় দেখা গেছে, এ ৭ মাস সময়কালে মোট বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বছরের সমগ্র বৃষ্টিপাতের মাত্র ২২ শতাংশ, অন্য দিকে এ সময়ে প্রস্বেদনের পরিমাণ বর্ষিত বৃষ্টিপাতের তুলনায় চার গুণ বেশি। শুষ্ক মৌসুমে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভূ-উপরিভাগের পানির দুষ্প্রাপ্যতা দেখা দেয় এবং এ সময়ে কৃষকগণ তাদের ফসল উৎপাদনে প্রয়োজনীয় সেচের পানির জন্য ভূ-পর্তস্থ পানির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

পঞ্চাশের দশকে ফ্লাড মিশনের সুপারিশের আলোকে তৎকালীন সরকার বন্যাজনিত ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্য নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী গ্রহণ করে। এ কর্মসূচীর মাধ্যমে দেশ জুড়ে সরকারীভাবে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ও স্লুইস গেট নির্মাণ করা হয়। আজ তিন/চার দশক পর এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, বন্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী দিয়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বা বন্যাজনিত ক্ষয়ক্ষতি না কমে বরং তা বেড়েছে, বেড়েছে বন্যার প্রকোপ এবং সৃষ্টি হয়েছে স্থায়ী জলাবদ্ধতা। যখন বন্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় তখন সমগ্র দেশের বন্যা কবলিত এলাকার আয়তন ছিল ১২/১৩ শতাংশের মধ্যে (বাৎসরিকভাবে), বর্তমানে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৩৪/৩৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

তাছাড়া ষাট-এর দশকে তদানীন্তন সরকার বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ৯৭টি পোল্ডার তৈরি করে। এরমধ্যে বৃহত্তর খুলনা ও যশোর জেলায় ৩৭টি পোল্ডার নির্মিত হয়। বর্তমানে এসব পোল্ডার সমগ্র দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে ব্যাপক পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে সুন্দরবন, বিলুপ্ত হচ্ছে জীব বৈচিত্র্য।

বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত আন্তর্জাতিক নদীর মধ্যে ৩টি মিয়ানমার থেকে এবং অন্য ৫৪টি নদী ভূটান, নেপাল, চীন ও ভারতে উৎপত্তি হয়ে তা সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। ইতিমধ্যে ভারত সরকার বাংলাদেশ ও ভারতের উপর দিয়ে প্রবাহিত অভিন্ন নদী বিশেষ করে গঙ্গা (ফারাক্কা), মহানন্দা, তিস্তাসহ বেশ কিছু নদীর উপর বাঁধ নির্মাণ করেছে এবং প্রস্তাবিত নদী সংযোগ প্রকল্পের মাধ্যমে ব্রহ্মপুত্র, মেঘনাসহ অবশিষ্ট নদীর উপরে বাঁধ নির্মাণের

প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। বর্তমানে ভারত নির্মিত চালু বাঁধের কারণে শুষ্ক মৌসুমে বাংলাদেশে নদীপ্রবাহ প্রায় ৩০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। বিশেষজ্ঞগণ আশংকা প্রকাশ করেছেন, নদী সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে তথা অবশিষ্ট নদীর উপর বাঁধ ও অন্যান্য নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে শুষ্ক মৌসুমে বাংলাদেশের নদীপ্রবাহ ৭০ শতাংশে হ্রাস পাবে। যা এদেশের জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলবে।

বাংলাদেশের প্রায় সমগ্র অধিবাসী ভূ-গর্ভস্থ পানিকে সুপেয় পানি হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। তাছাড়া বাংলাদেশের বোরো-ধান সহ শুষ্ক মৌসুমের প্রায় সকল ফসলই ভূ-গর্ভস্থ পানির সেচের উপর নির্ভরশীল। বর্তমানে বাংলাদেশের ভূ-গর্ভস্থ জলসম্পদ আর্সেনিক দ্বারা দূষিত হয়ে পড়েছে। গত শতকের নব্বইয়ের দশক থেকে এ পর্যন্ত বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে বাংলাদেশের অধিকাংশ জেলার (৬১ টি জেলা) ভূ-গর্ভস্থ পানিতে রয়েছে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক।

৩. বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল অঞ্চল ও সুপেয় পানির সংকট

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল অঞ্চলে অর্থাৎ বৃহত্তর খুলনা ও যশোরের নিম্নাংশে সুপেয় পানি সংকটের মূল কারণ লবণাক্ততা এবং যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আর্সেনিক সমস্যা। এ সংকট এত গভীর যে কোথাও কোথাও পরিবারের মহিলাদের দিনের একটি বড় অংশ কেটে যায় পানীয় জল সংগ্রহের জন্য। বিশেষজ্ঞরা ধারণা করছেন, পৃথিবীর অন্য অঞ্চলের মত বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল অঞ্চলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বছরে ৩ থেকে ৪ মিলি মিটার করে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সে কারণে নূতন নূতন এলাকায় লবণ পানি প্রবেশের ঝুঁকি বাড়ছে। ফলে মিষ্টিপানির দুষ্প্রাপ্যতার ঝুঁকি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। লবণাক্ততার পাশাপাশি এ অঞ্চলের অধিকাংশে নলকূপের পানিতে রয়েছে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক ও আয়রণ। ফলে দেশের অন্যান্য এলাকার তুলনায় এ অঞ্চলে খাবার পানির সমস্যা আরো প্রকট।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল অঞ্চল অনন্য প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এ উপকূল অঞ্চল বাংলাদেশের মূল ভূখন্ডের অংশ নয় বা তার সম্প্রসারিত অংশও নয়। এর সবটুকুই হলো উপকূলীয় জলাভূমি এবং ঈষৎ লবণ পানির এলাকা। এখানকার জীববৈচিত্র্য অনন্য সাধারণ। বহু সংখ্যক সামুদ্রিক জলজ প্রাণী তাদের জীবন চক্রের একটি নির্দিষ্ট সময় এখানে অতিবাহিত করে। পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সুন্দরবন এখানে অবস্থিত। সুন্দরবন থেকে বছরে প্রায় সাড়ে তিন মিলিয়ন টন গাছের পাতা এ জলাভূমিতে পতিত হয় এবং তা সরাসরি খাদ্যকণায় রূপান্তরিত হয়ে জোয়ার-ভাটার মাধ্যমে সুন্দরবন সংলগ্ন জলাভূমি ও সমুদ্রের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে যা এ অঞ্চলের জলজ প্রাণীদের খাদ্যের অন্যতম প্রধান উৎস। এ জলাভূমি সাধারণত দিনে ২ বার সমুদ্রের জোয়ার-ভাটা দ্বারা প্লাবিত হয়ে থাকে এবং এর জৈবিক উৎপাদনশীলতা অনেক বেশী। এলাকার অধিকাংশে পাহপালা লবণ সহনশীল এবং অসংখ্য স্থানীয় জাতের ধানও আছে যা লবণ সহনশীল। এ অঞ্চল মূলতঃ পাললের প্লাবনভূমি। অতীতে এ অঞ্চলের নদ-নদী সমূহ গঙ্গা নদীর মিষ্টিপানি প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত ছিল বলে এ অঞ্চলে লবণপানির প্রভাব ছিল কম। কিন্তু বর্তমানে নানা কারণে এ অঞ্চল তীব্র লবণাক্ত অঞ্চলে পরিণত হয়েছে, জনজীবনে দেখা দিয়েছে সুপেয় পানির তীব্র সংকট। নিম্নে কারণগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো–

ক. মিষ্টিপানি প্রবাহের বিপর্যয়

এক সময় বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল অঞ্চলের মধ্য দিয়ে গঙ্গা নদী প্রবাহিত হত। সে কারণে গঙ্গার মিষ্টিপানির প্রবাহে এ অঞ্চল সমৃদ্ধ ছিল। এ অঞ্চলের কৃষি জমি খুব উর্বর। মূলতঃ এখানে মিষ্টিপানি প্রবাহের ক্ষেত্রে দু'বার বিপর্যয় ঘটে :

প্রথমতঃ গঙ্গা নদীর গতিমুখ পরিবর্তন,
দ্বিতীয়তঃ মাথাভাঙ্গা নদীর উৎসমুখ বন্ধ হয়ে যাওয়া।

গঙ্গা নদীর গতিপথ পরিবর্তন

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া-যশোহর জেলার উপর দিয়ে গঙ্গা নদীর স্রোতধারা প্রবাহিত হত। এর পর থেকে প্রাকৃতিক কারণে গঙ্গা ধীরে ধীরে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে তার গতিপথ পরিবর্তন করতে থাকে। পরিণতিতে এ অঞ্চলের মিঠাপানির সরবরাহও কমতে থাকে। গঙ্গা নদীর গতিপথ পরিবর্তনের ফলেই এ অঞ্চলে মিঠাপানি প্রবাহের প্রথম বিপর্যয় ঘটে, মিঠাপানি নির্ভরশীল কৃষি ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে এবং সুপেয় পানির ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হয়।

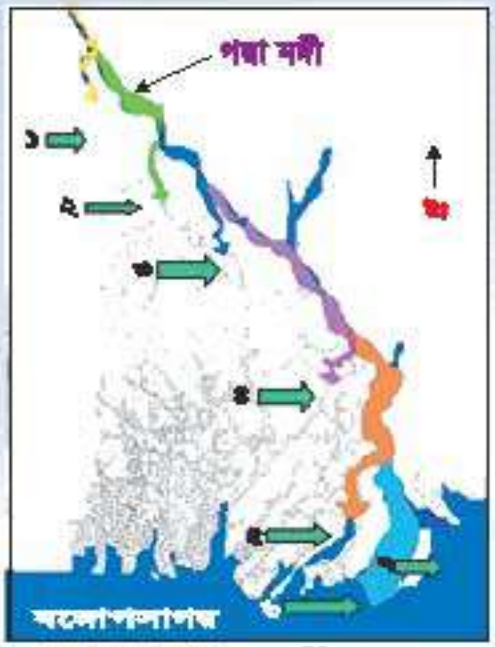

১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ ও ৭ দ্বারা বিভিন্ন সময়ে গঙ্গা নদীর পরিবর্তিত গতিপথ

মাথাভাঙ্গা নদীর উৎসমুখ বন্ধ হয়ে যাওয়া

এ অঞ্চলে মিঠাপানি প্রবাহের ক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার বিপর্যয় ঘটে ঊনবিংশ শতাব্দিতে গঙ্গার শাখা নদী মাথাভাঙ্গার উৎসমুখ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর। ঔপনিবেশিক শাসক গোষ্ঠী কোলকাতা থেকে উত্তর বাংলায় যাতায়াতের জন্য মাথাভাঙ্গা নদী ব্যবহার করতো। মাথাভাঙ্গার তীব্র স্রোত প্রায়শই বিভিন্ন ধরনের নৌ-দুর্ঘটনার সৃষ্টি করতো এবং দুর্ঘটনায় বেশ প্রাণহানি ঘটতো। তাই মাথাভাঙ্গা নদীর তীব্র স্রোত হ্রাস করার জন্য নদীর উৎসমুখে তারা পাথর ভর্তি বড় বড় নৌকা ডুবিয়ে দেয়। এর ফলে সাময়িকভাবে মাথাভাঙ্গার তীব্র স্রোত হ্রাস পায়। কিন্তু পরবর্তীকালে মাথাভাঙ্গা নদীর উৎসমুখে স্থায়ীভাবে চর পড়ে যায়, মাথাভাঙ্গা নদী গঙ্গা নদী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং বর্ষা মৌসুমে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন চ্যানেলে পরিণত হয়।

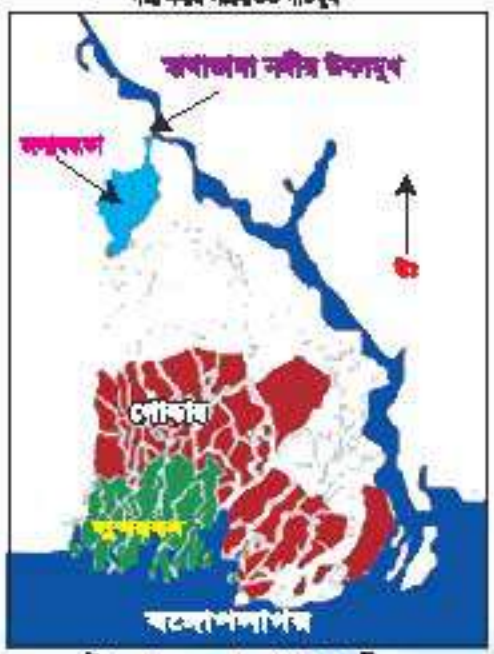

বৃটিশ সরকার মাথাভাঙ্গা নদীকে পুনর্জীবিত করার জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। তবে কোনটিই শেষ পর্যন্ত কার্যকর হয়নি। ১৯১৮ সালে বিশ্ববিখ্যাত পানি বিজ্ঞানী উইলিয়াম কক্স মাথাভাঙ্গা নদীর নিম্নাঞ্চলে গঙ্গা নদীতে বাঁধ দিয়ে বাঁধের উজানে গঙ্গা নদীর পানির উচ্চতা ৭ ফুট বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনা পেশ করেন। এ পরিকল্পনার মাধ্যমে মাথাভাঙ্গা নদী পুনর্জীবিত হবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। কিন্তু তার পরিকল্পনা বৃটিশ সরকার বাস্তবায়ন করেনি।

ঊনবিংশ শতাব্দিতে মাথাভাঙ্গা নদীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ফলে যশোর ও কুষ্টিয়া অঞ্চলে ব্যাপক মানবিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়। এ অঞ্চলে কলেরা ও ম্যালেরিয়া মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ে এবং হাজার হাজার লোকের অকাল মৃত্যু হয়। ঠিক একইভাবে কৃষির উৎপাদনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ে। সুন্দরবনের উৎপাদন

উৎসমুখ বন্ধ হওয়া মাথাভাঙ্গা নদী

এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়। যেমন-সুন্দরবনের অভ্যন্তরীণ প্রায় অর্ধেক কপোতাক্ষ নদীর শাখা নদী কপোতাক্ষ ও বেতনা নদীর উপর নির্ভরশীল এলাকার আশপাশের বনাঞ্চলের গাছপালার ধরনের ব্যাপক পরিবর্তন হয়, কম লবণসহনশীল গাছের পরিবর্তে অধিক লবণসহনশীল গাছের বিস্তার ঘটে। কপোতাক্ষ নদীর অববাহিকা তথা ঝিকরগাছা, চৌগাছা এবং বেতনা নদীর উপর নির্ভরশীল এলাকার মিঠাপানির দুষ্প্রাপ্যতা সৃষ্টি হয়। সাগর থেকে লবণ পানি উপকূল অঞ্চলে ঢুকে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত লবণ পানি উপকূলীয় জলাভূমির সম্পূর্ণ এলাকা গ্রাস করে ফেলে।

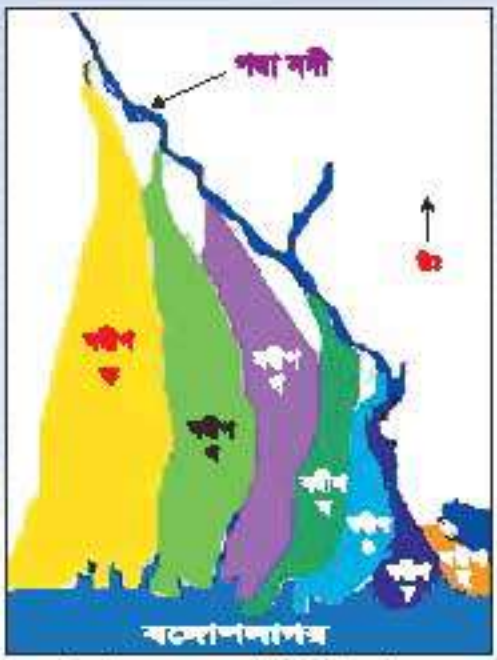

ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ এবং ছ হলো পদ্মা নদীর অববাহিকায় গড়ে ওঠা বাংলার মূল বদ্বীপ

গ. বাঁধের কারণে উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প

নদী ও জোয়ারের বাহিত পলি অবক্ষেপণের মাধ্যমে উপকূলীয় অঞ্চলের ভূমি গঠিত হয়। ষাট-এর দশকে সমুদ্র বিধৌত এবং উপকূলীয় জলাভূমিকে লবণ পানির প্রভাব থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। উপকূলীয় বাঁধ নির্মিত হওয়ার কারণে এ অঞ্চলের ভূমিগঠন সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হওয়ার পূর্বেই উপকূলীয় জলাভূমির সাথে নদীগুলোর সম্পর্ক ছিন্ন হয়। সেকারণে জোয়ার বাহিত পলি এ সকল জলাভূমিতে সঞ্চিত না হয়ে নদীর বুক বা তলদেশে পড়ে নদী ভরাট হতে থাকে। পলি পড়ে নদী সমূহ বিলগুলোর তুলনায় নদীর তলদেশ উঁচু হয়ে যায়। নদীপথে বিলের পানি নিষ্কাশিত হতে না পেরে সৃষ্টি হয় জলাবদ্ধতা। আবার কোন কোন অঞ্চলে বিলের মধ্যে জমে থাকা বৃষ্টির পানির সাথে উঁচু জোয়ারের লোনাপানি ঢুকে জলাবদ্ধতা সমস্যা আরো দীর্ঘতর হচ্ছে এবং মিঠাপানি বা সুপেয় পানির দুষ্প্রাপ্যতা দেখা যাচ্ছে।

ঘ. শুষ্ক মৌসুমে পদ্মা নদীর প্রবাহ হ্রাস

পদ্মা তথা গঙ্গাই বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত সর্ববৃহৎ নদী। এক সময় শুষ্ক মৌসুমে প্রায় দৈনিক ২ লক্ষ কিউসেক পানি এ নদী দিয়ে প্রবাহিত হত। এমনকি ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে এর প্রবাহ ছিল প্রায় ১ লক্ষ ৩৫ হাজার কিউসেক। কিন্তু ফারাক্কার উজানে বিহার, উত্তর প্রদেশ, হরিয়ানা প্রভৃতি এলাকাতে কৃষি ও গৃহস্থালী কাজের জন্য শুষ্ক মৌসুমে পানি প্রত্যাহার করার ফলে পদ্মা নদীর পানি প্রবাহ হ্রাস পেয়ে বর্তমানে ফারাক্কা পয়েন্টে ৫৭/৫৮ হাজার কিউসেকে দাঁড়িয়েছে। ফারাক্কা পানি বণ্টন চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ পাবে ২৭,৫০০ কিউসেক (সর্বনিম্ন প্রবাহকালীন), অবশিষ্ট অংশ পাবে ভারত। উপরন্তু হুগলী নদীর নাব্যতা রক্ষার জন্য ভারতের সর্বনিম্ন ৪০ হাজার কিউসেক পানি প্রবাহের প্রয়োজন। এ পানি তারা ফারাক্কা থেকে ফিডার ক্যানেলের মাধ্যমে হুগলী নদীতে প্রবাহিত করে থাকে।

উপরোক্ত বিষয় বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ভারত মূলতঃ ২টি প্রক্রিয়ায় গঙ্গা দিয়ে পানি প্রত্যাহার করে নিচ্ছে :

প্রথমত : বিহার, উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, হরিয়ানা ইত্যাদি অঞ্চলে শুষ্ক মৌসুমে কৃষি কাজের জন্য পানি প্রত্যাহার।

দ্বিতীয়ত : কলিকাতা বন্দরের নাব্যতা রক্ষার জন্য ফিডার ক্যানেলের মাধ্যমে ভাগীরথী নদীতে পানি প্রত্যাহার এবং এ পানি প্রত্যাহারের পরিমাণ শুষ্ক মৌসুমে সর্বনিম্ন ৪০ হাজার কিউসেক।

ভারতের এ পানি প্রত্যাহারের কারণে রূপসাসহ অন্যান্য নদীতে লবণাক্ততার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। নদীর পানিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধির কারণে যে সকল সমস্যা দেখা দিয়েছে তা নিম্নরূপ :

- লবণাক্ততার কারণে খুলনার বিভিন্ন কলকারখানার যন্ত্রপাতি দ্রুত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।
- শুষ্ক মৌসুমে খুলনার বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় মিষ্টিপানি বহুদূর (মধুমতি) থেকে আনতে হচ্ছে ফলে বিদ্যুতের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- উপকূলীয় অঞ্চলের কৃষি ব্যবস্থা ও জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হচ্ছে।
- বৃহত্তর ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সুন্দরবনের পূর্বাংশে সুন্দরী গাছের আশামরা রোগ দেখা দিয়েছে।
- মিষ্টিপানির আধার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সুপেয় পানির সমস্যা তাই বেড়েছে।

ঘ. লোনাপানির চিংড়ি চাষ

বর্তমানে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের প্রায় সকল জলাভূমিতেই চিংড়ির চাষ হচ্ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নদী থেকে লবণ পানি পোল্ডারের মধ্যে উঠিয়ে চিংড়ি চাষ করা হচ্ছে। ফলে পোল্ডারের মধ্যকার যে সমস্ত পুকুরের পানি অতীতে মিষ্টি ছিল এখন পাশের চিংড়ি ঘেরের লবণ পানি চুইয়ে পুকুরে প্রবেশ করার ফলে পুকুরের মিষ্টিপানি লবণাক্ত পানিতে পরিণত হয়েছে। তাছাড়া ঘেরের জলাভূমিতে বছরের অধিকাংশ সময় স্থায়ীভাবে লোনাপানি জমে থাকার কারণে এ পানি চুইয়ে ভূ-গর্ভস্থ মিষ্টিপানিকে লবণাক্ত পানিতে রূপান্তরিত করছে। ফলে যেসব অগভীর নলকূপে ইতিপূর্বে মিষ্টিপানি পাওয়া যেত এখন সেগুলোতে লোনাপানি পাওয়া যাচ্ছে। ফলে দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত পানি সংকটের (গোসল করা, হাতমুখ ধোয়া, কাপড় কাচা) পাশাপাশি সুপেয় পানির সংকট আরো তীব্র হয়েছে। অতীতে বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রামের মানুষ যারা গ্রামের মধ্যে অবস্থিত পুকুর বা নলকূপের পানি খাবার পানি হিসেবে ব্যবহার করতো, চিংড়ি চাষের কারণে বর্তমানে তারা দূরবর্তী অঞ্চল থেকে সুপেয় পানি সংগ্রহে বাধ্য হচ্ছে।

ঙ. আর্সেনিক দূষণ

বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মত এ এলাকার ভূ-গর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক দূষণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অধিকাংশ অগভীর নলকূপের পানি আর্সেনিক বিষে আক্রান্ত। লবণাক্ততার পাশাপাশি আর্সেনিক সমস্যা এ অঞ্চলের সুপেয় পানির সংকট আরো বাড়িয়ে তুলেছে। উত্তরণ পরিচালিত Ground Water Arsenic Clamity নামক গবেষণা রিপোর্ট থেকে জানা যায় দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ৭৯% নলকূপে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক রয়েছে যা স্বাস্থ্যের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর।

চ. ভূ-গর্ভস্থ জলাধারের অভাব

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল এলাকায় লবণাক্ততার পাশাপাশি ভূ-গর্ভস্থ জলাধারের অভাব একটা বড় সমস্যা। এ এলাকায় অবস্থান ব-দ্বীপের নিম্নাংশে হওয়াতে নদীবাহিত অতি সূক্ষ্মদানার বালি বা পলির আধিক্য থাকায় ভূ-গর্ভে জলাধারের জন্য উপযুক্ত মোটাদানার বালি বা পলির স্তর খুব কম পাওয়া যায়। আর পাওয়া গেলেও এ বালির স্তরের পুরুত্ব খুবই কম এবং কোথাও কোথাও তার অবস্থান ভূমির এত গভীরে যে সেখান থেকে মিষ্টিপানি উত্তোলন করা খুব দুরূহ ও ব্যয়সাপেক্ষ। কয়রা, পাইকগাছা, আশাশুনি, শ্যামনগর, কালিগঞ্জ, দেবহাটা, দাকোপ, মংলা, শরণখোলা প্রভৃতি উপজেলায় এ সমস্যা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। এ সব এলাকার জনসাধারণের কোন কোন স্থানে ২ কিলোমিটার আবার কোন কোন স্থানে ৭/৮ কিলোমিটার দূর থেকে খাবার পানি সংগ্রহ করতে হয়।

ঙ. ভূমির নিম্নগমন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব-দ্বীপ গবেষণা ইনষ্টিটিউটের পরিচালক ড. মনিরুল হকের এক গবেষণা থেকে জানা যায় এ জলাভূমির অধিকাংশে এলাকার বছরে ১ থেকে ২ সেঃ মিঃ ভূমির নিম্নগমন হচ্ছে। উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে নদীবাহিত পলি এ জলাভূমিতে অবক্ষেপিত হত বলে ভূমি নিম্নগমনের হারের তুলনায় ভূমি গঠনের হার ছিল বেশি। এ প্রক্রিয়ায় ধীরে ধীরে ভূমির উচ্চতাও বৃদ্ধি পাচ্ছিল। কিন্তু উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণের পরে নদীবাহিত পলিমাটি দ্বারা এ ভূমিগঠন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়। বিগত ৩/৪ দশক ধরে ভূমির একতরফা নিম্নগমনের ফলে ওয়াপদা বাঁধের ভিতরে অবস্থিত ভূমি ক্রমান্বয়ে নিচু হয়েছে এবং লবণাক্ত এলাকার পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে।

জ. অপরিকল্পিত ভূ-গর্ভস্থ পানির মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার

দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকার ইষৎ লবণাক্ত জলাভূমি বাদে একটি বিস্তীর্ণ এলাকায় ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলন করে শুষ্ক মৌসুমে বোরো ধানের চাষ করা হয়। মূলতঃ আশির দশকে গভীর ও অগভীর নলকূপ খনন করে তার মাধ্যমে শুষ্ক মৌসুমে সেচের সুবিধা সৃষ্টি করা হয়। ক্রমান্বয়ে আরও অধিক পরিমাণ এলাকায় এ কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়ে পড়ে। শুষ্ক মৌসুমে সেচের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও অধিক পরিমাণ পানি উত্তোলনের ফলে ভূ-গর্ভস্থ জলাধারের বিপর্যয় সৃষ্টি হচ্ছে। কারণ নলকূপের মাধ্যমে যত দ্রুত ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলন করা যায় তত দ্রুত বর্ষা মৌসুমে ভূ-গর্ভস্থ জলাধারগুলো বৃষ্টির পানি দ্বারা পুনর্ভরণ (পুষ্ট) হতে পারে না। জলাধারগুলো পরিপূর্ণ হতে দীর্ঘ সময় লাগে। অন্যদিকে ভূ-গর্ভস্থ পানি আর্সেনিক দ্বারা দূষিত হলেও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষ সুপেয় পানির জন্য ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরশীল। অপরিকল্পিতভাবে মাত্রাতিরিক্ত ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের ফলে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে দীর্ঘমেয়াদী সুপেয় পানি সংকটের সৃষ্টি হচ্ছে। অতিরিক্ত পানি উত্তোলনের ফলে ভূ-গর্ভস্থ পানি স্তর ক্রমশ নীচে নেমে যাচ্ছে এবং শুষ্ক মৌসুমে খরার প্রকোপ বেড়েছে। 'জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্প'-এর আওতায় সম্প্রতি দেশের ভূ-গর্ভস্থ পানি সম্পদের উপর ওয়ারপো-এর সমীক্ষায় বিগত ১০ বছরে দেশের ভূ-গর্ভস্থ পানি স্তরে অবনয়নের কথা বলা হয়েছে। সমীক্ষায় বলা হয় সেচ ব্যবস্থায় পাম্প প্রক্রিয়ায় ক্রমাগত ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের কারণে ভূ-গর্ভস্থ পানির অনুপ্রবাহ হ্রাস পেয়েছে।

৪. লবণমুক্ত খাবার পানির আগামী সংকট

দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল অঞ্চলের লবণমুক্ত খাবার পানির বর্তমান সংকট আগামীতে আরও বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। সুপেয় পানির এ ভবিষ্যৎ সংকটের একটি কারণ হলো বিশ্বব্যাপী জলবায়ুর পরিবর্তন এবং অন্যটি হলো ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প। নীচে এ বিষয়ে আলোচনা করা হলো ঃ

ক. জলবায়ু পরিবর্তন

সমগ্র বিশ্বের বিশেষজ্ঞগণের মতামতের মাধ্যমে এটা সত্য বলে প্রতীয়মান হয়েছে যে, জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ হবে একটি। বর্তমানে এদেশের জলবায়ু স্বতন্ত্র ও অস্থায়ীভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে। জলবায়ুর বর্তমান অবস্থা এবং বিরূপ আবহাওয়ার কারণে সংঘটিত কিছু সংবেদনশীল ঘটনায় বোঝা যায় যে, জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য এ দেশ খুবই ঝুঁকিপূর্ণ হবে।

বাংলাদেশের জলবায়ুতে পানি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিপর্যয় দেখা যায়, যা এদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন-জীবিকায় ব্যাপক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। এ থেকেও ভবিষ্যতের ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা সহজে অনুমান করা যায়। পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক পানি থাকলেও বাস্তবে পানি সম্পদের উপর এদেশের নিয়ন্ত্রণ খুব কম। জলবায়ুর বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করলে অনুভব করা যায় এ দেশে

প্রায়ই পানি সংক্রান্ত বিপর্যয় দেখা দেবে। বর্ষা মৌসুমে নীচু জমিগুলো প্লাবিত হবে। শুষ্ক মৌসুমে নদী ও ভূ-গর্ভের পানির স্তর নীচে নেমে যাওয়ার ফলে খরার প্রকোপ বাড়বে। শুষ্ক মৌসুমে নদীতে পানিপ্রবাহ কমার কারণে ক্রমবর্ধমান লবণাক্ততা মাটির আরো ভিতরে প্রবেশ করবে এবং উপকূলীয় জলাভূমি চাষাবাদের অনুপযোগী হয়ে পড়বে। অগভীর জলাধারেও লবণাক্ততার মাত্রা বাড়বে এবং উপকূল এলাকায় লবণমুক্ত খাবার পানির পর্যাপ্ততা আরো কমে যাবে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চল জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে বেশী ঝুঁকির মধ্যে অবস্থিত। এ এলাকার দরিদ্র জনগণের পরিবর্তিত পরিস্থিতি এবং তার ফলে সংঘটিত আর্থসামাজিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতা কম থাকায় জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে তারা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

বিশেষজ্ঞদের মতে উন্নত বিশ্বের জীবাশ্মজাত জ্বালানিনির্ভর জীবনযাত্রার কারণে আশংকাজনকহারে ভূ-মণ্ডলে উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, পরিবর্তন ঘটছে পৃথিবীর জলবায়ুর। পৃথিবীর উষ্ণায়নের ফলে মেরু অঞ্চলের বরফ গলে এবং প্রচুর বৃষ্টিপাতের কারণে অন্ততঃ ৫টি ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। প্রায় ১৫ কোটি মানুষ হয়ে পড়বে বাস্তুচ্যুত। বাংলাদেশেরও একটি বড় অংশ (১৪-১৭ ভাগ) পানির নীচে তলিয়ে যাবে। এতে এ দেশের ২ কোটি মানুষ উদ্বাস্তু হবে। তথ্য মতে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ১ মিটার বাড়লে দেশের মোট আয়তনের ২২,৮৮৯ বর্গকিলোমিটার (বৃহত্তর খুলনার ৬৫ ভাগ, বরিশালের ৯৯ ভাগ, সম্পূর্ণ পটুয়াখালী, নোয়াখালীর ৪৪ ভাগ ও ফরিদপুরের ১২ ভাগ এলাকা) পানিতে তলিয়ে যেতে পারে।

পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে মত প্রকাশ করেছেন জাতিসংঘের ইন্টারন্যাশনাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (IPCC) এর চেয়ারম্যান ড. রাজেন্দ্র পাচু রায়, সার্ক আবহাওয়া গবেষণা কেন্দ্রের প্রাক্তন পরিচালক সাজেদুর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের অধ্যাপক ড. আব্দুর রব এবং মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক পরিবেশবিদ ড. হারুনর রশীদ খান। (আজকের কাগজ, ১৩ ডিসেম্বর ২০০৩)।

২০০১ সালের মার্চ মাসের মাঝামাঝি জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল জনাব কফি আনান বাংলাদেশ সফরে এসে জলবায়ুর পরিবর্তন সংক্রান্ত এক সেমিনারে আশংকা প্রকাশ করে বলেছিলেন, বাংলাদেশের সামনে এক মহা প্রলয়ঙ্করী প্রাকৃতিক বিপর্যয় অপেক্ষা করছে। আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট এ দুর্যোগের ধ্বংসকারী প্রভাব বিশ্বের অন্যান্য স্থানের তুলনায় বাংলাদেশের উপরেই হবে সবচেয়ে বেশি মারাত্মক। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকা সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে যাবে, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে সুন্দরবন এবং তার বিশ্ববিশ্রুত রয়েল বেঙ্গল টাইগার।

কফি আনানের এ আশংকা ধীরে ধীরে বাস্তবে রূপ নিতে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলায়ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে বিগত ত্রিশ বছর ধরে প্রতি বছর এ অঞ্চলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির হার ৩ থেকে ৪ মিলি মিটার। অন্যদিকে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে খুবই কম। ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের ১ মিটার উচ্চতা বৃদ্ধিতে এ এলাকার সকল সুপেয় পানির উৎস সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

খ. ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প

২০৫০ সাল পর্যন্ত ক্রমবর্ধিত জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা পূরণ, উন্নত সভ্যতার জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদন, সস্তায় পানি পথে পরিবহণের সুযোগ সৃষ্টি, সুপেয় পানি সমস্যা দূর করা, ভূ-গর্ভস্থ জলাধার পুনর্ভরণের মাধ্যমে এলাকার উন্নয়ন সাধন করা, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং শিল্প ও পর্যটনের বিকাশসহ বহুমাত্রিক উন্নয়নের নামে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ভারত সরকার ২০১৬ সালের মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প (River Linking Project) নামক এক মহাপরিকল্পনা তৈরী করেছে। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে প্রয়োজন হবে ৫ লক্ষ ৬০ হাজার কোটি ভারতীয় রূপী।

ভারত এ প্রকল্পে উদ্বৃত্ত পানি আছে এমন ৩৭টি নদীর মধ্যে আন্তঃসংযোগ স্থাপনের জন্য ৩০টি সংযোগ খাল খনন করবে। ব্রহ্মপুত্র নদীতে এবং ব্রহ্মপুত্র উৎস নদী মানস ও সংকোষের উপরেও বাঁধ নির্মাণ করবে। ব্রহ্মপুত্রের পানি ভারত ভূ'ভাগে রাষ্ট্রের দু'দিকে নিয়ে যাবে। একটি উড়িষ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক এবং নেপাল থেকে গঙ্গার যেসব উৎস নদী আছে তার সবগুলোর উপর বাঁধ দিয়ে ফারাক্কার উজান থেকে গঙ্গার প্রবাহ প্রত্যাহার করে তা পাহাড় পর্বত কেটে বা কোথাও পাম্প করে উত্তর প্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান ও গুজরাটে নিয়ে যাবে।

ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের ভিতরে নদী প্রবাহ আশংকাজনকভাবে হ্রাস পাবে। ভারত মানস ও সংকোষ নদীর পানি প্রত্যাহার করে নিলে শুষ্ক মৌসুমে ব্রহ্মপুত্রের পানি প্রবাহ শতকরা ৩০/৪০ ভাগ কমে যাবে। তাছাড়া ব্রহ্মপুত্রের পানি প্রত্যাহার করে নিলে শুষ্ক মৌসুমে ব্রহ্মপুত্রের কোন প্রবাহই আর বাংলাদেশে প্রবেশ করবে না। ফলে বাংলাদেশের নদীগুলো নাব্যতা হারাবে। সমুদ্রের লোনা পানি উপরে উঠে আসবে, দেশব্যাপী লবণাক্ততা সমস্যা দেখা দেবে। সুপেয় পানির সংকট বাড়বে। বাংলাদেশের নদীপথসমূহ বন্ধ হয়ে যাবে। কৃষি ব্যবস্থাসহ নদীভিত্তিক অর্থনীতি বিপর্যস্ত হবে। জীববৈচিত্র্য, সুন্দরবন ও পরিবেশের বিপর্যয় দেখা দেবে। এদেশের ১০ কোটিরও বেশি মানুষের জীবন বিপন্ন হবে।

বর্তমানে দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল অঞ্চলের মিষ্টিপানির প্রধান উৎস গড়াই ও মধুমতি নদী। আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে এ দুটো নদীতে মিষ্টিপানির প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাবে। মিষ্টিপানির অভাবে এ অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, হারিয়ে যাবে সুন্দরবনের সুন্দরী গাছ। কেওড়া, গরান ও গেওয়া গাছের ঝোপ-ঝাড়ে পরিণত হবে সুন্দরবন। এ অঞ্চলের বর্তমান কৃষি ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে পড়বে, সুপেয় পানির সংকট আরও বাড়বে।

৫. লবণাক্ততা মুক্ত সুপেয় পানি সংকটে বিপর্যস্ত জনজীবন

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় জনপদের সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাট জেলার শ্যামনগর, আশাশুনি, কালিগঞ্জ, তালা, দেবহাটা, কয়রা, পাইকগাছা, দাকোপ, বটিয়াঘাটা, ডুমুরিয়া, মংলা, রামপাল, চিতলমারী, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট ও শরণখোলা উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে রয়েছে খাবার পানির তীব্র সংকট। এ এলাকার প্রায় ৫০ লক্ষ মানুষ কমবেশী খাবার পানি সংকটে ভুগছেন। এক কলস খাবার পানি সংগ্রহের জন্য মহিলা ও শিশুরা ছুটছে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে। আর্সেনিক দূষণমুক্ত নলকূপ বা PSF এর পানি সংগ্রহের জন্য তাদের দিতে হচ্ছে দীর্ঘ লাইন। কোন কোন গ্রামে মিষ্টিপানির উৎস বলতে রয়েছে শুধুমাত্র ২/১টি পুকুর। অধিকাংশ গ্রামের মহিলা ও শিশুদের এক কলস সুপেয় পানি সংগ্রহের জন্য কমপক্ষে ২ কিলোমিটার দূরে যেতে হয়। কোন কোন গ্রাম থেকে যেতে হয় ৫/৬ কিলোমিটার দূরে। একটি পরিবারের দৈনিক গড় খাবার পানির চাহিদা ৩ কলস পানি সংগ্রহের জন্য প্রতিদিন কমপক্ষে ৬ থেকে ১২ কিলোমিটার পথ হাঁটতে হয়। বিপদের আশংকায় পানির কলসের সঙ্গে কোলের শিশুটিকেও বহন করতে হয়। কোথাও কোথাও পানি সংগ্রহের জন্য পাড়ি দিতে হয় গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদী। কাপড় পরিষ্কার করার জন্যও দূর থেকে মিষ্টিপানি বয়ে আনতে হয়। বাড়ীতে আত্মীয়-স্বজন বেড়াতে এলেও পানির প্রয়োজন বাড়ে, বাড়ে ভোগান্তি।

পানিতে লবণাক্ততা, আয়রণ ও মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিকের উপস্থিতির কারণে বর্তমানে এ জনপদের বিশাল জনগোষ্ঠীর খাবার পানির প্রধান ভরসা বৃষ্টি ও পুকুরের পানি। সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে এ জনপদের মানুষের চাহিদা অনুযায়ী বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের জন্য

কেস স্টাডি - ১

পারিবারের খাবার পানি সংগ্রহে সমস্যার কারণেই বিয়ে হচ্ছে না স্বপ্নার। পানি সংগ্রহে অক্ষম নিতান্ত গরীব বৃদ্ধ পিতামাতার তৃতীয় কন্যা স্বপ্না। তার পিতা স্বপ্নার আগের দুই বোনকে বিয়ে দিলেও স্বপ্নাকে বিয়ে দিচ্ছে না এ ভেবে "স্বপ্না না থাকলে তাদের পানি বিহীন মরতে হবে"।

সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলার গাবুরা ইউনিয়নের ডুমুরিয়া গ্রামে স্বপ্নাদের বসবাস। এ গ্রামে প্রায় ৬০০ পরিবার বাস করে। খাবার পানির উৎস বলতে সরকারীভাবে বসানো একটি PSF ছিল যা বর্তমানে নষ্ট হয়ে পড়ে আছে। গ্রামবাসীদের ২ কিলো মিটার দূরের সোরা গ্রামের পুকুরে স্থাপিত PSF থেকে পানি এনে খেতে হয়। শুষ্ক মৌসুমে এই পুকুরও শুকিয়ে যায়। তখন নৌকোয় করে ৩ কিলোমিটার দূরের গ্রাম বুড়িগোয়ালিনি থেকে পানি সংগ্রহ করতে হয়।

কেস স্টাডি - ২

কলস ভরে খাবার পানি এনে বাড়ি বাড়ি বিক্রি করা সুন্দরীর পেশা। পানি বিক্রি করেই ১০ বছর যাবৎ জীবিকা নির্বাহ করছে আত্মীয়স্বজনহীন নিঃসঙ্গ ৫৫ বছরের বিধবা সুন্দরী।

বুড়িগোয়ালিনি গ্রামে ছোট একটি কুড়েঘরে সুন্দরীর বসবাস। তার বাড়ি থেকে ২.৫ কিলোমিটার দূরে গ্রামের অন্য প্রান্তের PSF থেকে প্রতিদিন পানি এনে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিতে হয় তাকে। সুন্দরী গ্রামের সকল মানুষের কাছে দিন দিন অত্যাবশ্যকীয় হয়ে উঠছে।

কেস স্টাডি - ৩

পাইকগাছা উপজেলার লতা ইউনিয়নের শামুকপোতা গ্রামের কালিদাসী, আলুলতা ও মনিষা। শামুকপোতা গ্রামে পানযোগ্য মিষ্টিপানির কোন উৎস নেই। এ গ্রামে কয়েকটি নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে, কিন্তু সে পানিতে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক ও লবণ। ফলে তাদের ৩ কিলোমিটার দূরে বাহিরবুনিয়া গ্রামের ভোলা মন্ডলের বাড়ীর সামনের নলকূপ থেকে পানি এনে খেতে হয়। কালিদাসী, আলুলতা ও মনিষারা জানেনা খাবার পানি সংগ্রহরে জন্য তাদের এ পথ চলা কবে শেষ হবে।

তেমন কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। পুকুর থেকে পানি সঞ্চয় করে বিশুদ্ধ করার পদ্ধতি (পিএসএফ) ও বৃষ্টির পানি ব্যবহার করার জন্য কিছু প্রকল্প থাকলেও তা চাহিদার তুলনায় নিতান্তই নগণ্য। ফলে আয়রন, আর্সেনিক এবং লবণমুক্ত বিশুদ্ধ খাবার পানির জন্য আশাশুনি, শ্যামনগর, দাকোপ, কয়রা, মংলা ইত্যাদি প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রামের মানুষ এখন ছুটছে শহরে। পৌরসভার সরবরাহ করা পানি ড্রাম ও কন্টেনার ভরে নিয়ে আসা হচ্ছে শহর থেকে গ্রামে।

সুপেয় পানি (খাবার পানি) সংকটের কারণে প্রয়োজনের তুলনায় কম পানি পান করা অথবা লবণাক্ত, দূষিত বা আর্সেনিকযুক্ত পানি পান করার ফলে দেখা দিচ্ছে নানা শারীরিক সমস্যা। বিভিন্ন ধরনের চর্মরোগ, পেটের পীড়া, আমাশয়, জ্বর, ডায়রিয়া ইত্যাদি মানুষের নিত্য সঙ্গী। মহিলা ও শিশুদের অপুষ্টি, গর্ভবতী মহিলাদের প্রজনন সমস্যা, গায়ের রং কালো হয়ে যাওয়া, চুল লাল হয়ে যাওয়া, উচ্চ রক্তচাপ রোগীদের শারীরিক সমস্যা, কর্মক্ষম মানুষের শারীরিক দুর্বলতা এবং মানসিক দুশ্চিন্তা লেগেই আছে।

সময়মত পানি না পাওয়ার জন্য এবং পানি সংগ্রহের কারণে সময়মত রান্না না করার জন্য পারিবারিক কলহ হচ্ছে, নারী নির্যাতন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া শিশুদের লেখাপড়ার ক্ষতি ও শিশুশ্রম, অতিথি আপ্যায়নের সমস্যা, পানি আনা-নেয়ার পথে মহিলাদের নানাভাবে নাজেহাল, মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার সমস্যা ও বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া, নীরবে এলাকা ত্যাগ করার হার (মাইগ্রেশন) বৃদ্ধি ইত্যাদি সামাজিক সংকট দেখা দিচ্ছে। পানিকে কেন্দ্র করে স্থানীয় গোলযোগ ও মামলা-মোকদ্দমা এখন নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা।

মিষ্টিপানির সংকটের ফলে কৃষি ক্ষেত্রে বিপর্যয়, ফলজ, বনজ ও ওষধি গাছের সংখ্যা লোপ, কম লবণ সহিষ্ণু বৃক্ষ মারা যাওয়া, দেশীয় প্রজাতির মাছ ধ্বংস হওয়া, মিঠাপানির মাছের খামারের বিলুপ্তি, জমির উর্বরতা হ্রাস, বিশ্ববিখ্যাত ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবনের জীব-বৈচিত্র্য ধ্বংস ও ব্যাপক ক্ষতি, নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য বিনষ্ট প্রভৃতি পরিবেশগত সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে।

কেস স্টাডি - ৪

এভাবে প্রতিদিন পানি আনতে যায় কিশোরী জেসমিন ও মর্জিনা। বয়স ১৩/১৪ বছর। পাইকগাছা উপজেলায় তাদের গ্রাম কাঠমারিতে বিশুদ্ধ পানির কোন উৎস না থাকায় ২ কিলোমিটার দূরে পার্শ্ববর্তী গদারডাঙ্গা গ্রামের নলকূপ থেকে প্রতিদিন পানি আনে এ দুই সহোদরা।

কেস স্টাডি – ৫

আশাশুনি উপজেলার শ্রীউলা গ্রাম। এখানে নলকূপের পানিতে রয়েছে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক অথবা তীব্র লবণ। বাধ্য হয়েই পুকুরের পানি পান করে গ্রামবাসী। কেউ কেউ বৃষ্টির পানি বা দূর থেকে আনা এক কলস পানি ১০ টাকা দিয়ে কিনে পান করে। এ গ্রামে রয়েছে ছোট বড় ৪টি পুকুর। কোন রকম শোধন ছাড়াই গ্রামবাসী এ পানি পান করে। পার্শ্ববর্তী ইউনিয়নের শিতলপুর গ্রাম এবং কালীগঞ্জ থানার চম্পাপুর ইউনিয়নের ইউসুপপুর গ্রামের মহিলারা নদী পাড়ি দিয়ে এ পুকুর থেকে পানি নিয়ে যায়। পুকুরের সব পানি খেয়ে ফেলার কারণে ফাল্গুন চৈত্র মাসে এ গ্রামের হারু বাবুর পুকুর ও মোল্যা বাড়ির পুকুর শুকিয়ে যায়। তখন গ্রামের শেষ প্রান্তে মহিউদ্দিন চৌধুরীদের পুকুর থেকে পানি আনার জন্য অতিরিক্ত ২ কিলোমিটার পথ হাঁটতে হয়।

সুপেয় পানি সংগ্রহের কাজে বেশী সময় নষ্ট হওয়ায় কর্মদিবসের অপচয়, টাকার বিনিময়ে খাবার পানি ক্রয়ের ফলে ব্যয় বৃদ্ধি, সবজি চাষের সুযোগ নষ্ট, সবজি ক্রয়ের ব্যয় বৃদ্ধি, অবকাঠামো (ঘরবাড়ি) দীর্ঘস্থায়ী না হওয়া, খাদ্যাভাব, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী পালনে অসুবিধা, জৈব সারের অভাব, চাষাবাদ ও কৃষিকাজে ক্ষতি প্রভৃতি অর্থনৈতিক সমস্যাও দেখা দিচ্ছে। সুপেয় পানি সংকটের কারণে দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের ভোগান্তির অন্ত নাই। মূলতঃ এ অঞ্চল লবণাক্ত অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। বাড়ীর উঠোন পেরুলেই লোনা পানি, নলকূপের পানি পুকুরের পানি সবই লোনা। এ পানি পান তো করা যায়ই না, পানিতে হাত মুখ ধুলেও চোখ জ্বালা করে। লোনা পানিতে কাপড় কাচলে সাবানের অপচয় হয় মাত্র, কাপড় ঠিকমত পরিষ্কার হয় না।

মূলতঃ পরিবারের মহিলারাই পানি সংগ্রহ করেন। পরিবারের পুরুষেরা এ বিষয়ে তেমন লক্ষ্য করেন না বরং কোন কারণে মহিলারা প্রয়োজনীয় খাবার পানি যোগান দিতে ব্যর্থ হলে সংসারে ঝগড়া বিবাদ শুরু হয়। পানি সংগ্রহের জন্য স্কুলগামী মেয়েদের লেখাপড়ার ক্ষতি হয়। পানির মধ্যে বসবাস করেও গোসল করার জন্য ঈষৎ মিষ্টিপানির সন্ধানে হেঁটে যেতে হয় অনেক দূর। পানি সংকটের কারণে এ অঞ্চলের কোথাও কোথাও অন্য এলাকার কোন মেয়ে বিয়ে দিতে চায় না।

কেস স্টাডি – ৬

প্রতিদিন ২ কিলোমিটার দূরের পুকুর থেকে পানি আনে কেশমনিরা। সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর থানার মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়নের পানখালি গ্রামে কেশমনিদের বসবাস। এ গ্রামে সুপেয় পানির কোন উৎস নেই। ওয়াপদা বাঁধের পাশ দিয়ে (প্রায় ২ কিলোমিটার) লম্বাভাবে অবস্থিত পানখালি গ্রামের একপাশে চুনকুড়ি নদী, অন্যপাশে চিংড়ি ঘের। ইতিপূর্বে এ গ্রামের ৩টি শিশু ঘেরের পানিতে ডুবে মারা গেছে। সে কারণে পানি আনতে যাওয়ার সময় এ গ্রামের মহিলারা কোলের শিশুটিকেও কলসের সঙ্গে বহন করে নিয়ে যায়।

৬. সুপের পানি সংকট নিরসনে জাতীয় উদ্যোগ ও সীমাবদ্ধতা

বাংলাদেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ইতিমধ্যে সরকার (ক) জাতীয় পানি নীতি, (খ) জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ও (গ) জাতীয় পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন নীতিমালা প্রণয়ন করেছে এবং উপকূলীয় অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত প্রকল্প সমূহের সমন্বয় সাধনের জন্য (ঘ) উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা (খসড়া) প্রণয়ন করেছে। এসব নীতিমালায় জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত কারণে লবণাক্ত এলাকা সম্প্রসারণের প্রেক্ষিতে সৃষ্ট দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল অঞ্চলের সুপেয় পানি (খাবার পানি) সংকট নিরসনের যথাযথ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে কিনা তা বিশ্লেষণের জন্য জাতীয় নীতিমালাগুলোর সুপেয় পানি সম্পর্কিত অংশসমূহ নীচে পর্যালোচনা করা হল :

ক) জাতীয় পানি নীতি

বাংলাদেশ সরকার ইতিমধ্যে জাতীয় পানি নীতি প্রণয়ন করেছে। জাতীয় পানি নীতির ঘোষণায় বলা হয়েছে " ... যেহেতু মানুষের জীবন ধারণ, দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সুরক্ষার জন্য পানি একান্ত প্রয়োজনীয়, সেকারণে ব্যাপক সমন্বিত ও সুষম ভিত্তিতে দেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সব পদ্ধতি ও কার্যক্রম গ্রহণ করাই সরকারের নীতি। অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, খাদ্যে সয়ংসম্পূর্ণতা, জনস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, জনগণের উন্নততর জীবনমান এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ সুরক্ষার যাবতীয় লক্ষ্য সমূহ পরিপূরণের উদ্দেশ্যে নিরবচ্ছিন্ন অগ্রযাত্রার জন্য এ নীতিমালা রচিত হয়েছে।"

জাতীয় পানি নীতিমালা পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এ নীতিমালার প্রধান সীমাবদ্ধতা হল এতে জলবায়ুর পরিবর্তন সম্পর্কে কোন অনুচ্ছেদ নেই। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত বিষয় জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে একদিকে পৃথিবীর তাপমাত্রা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে অন্যদিকে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতাও বাড়ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর অন্যতম ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হবে বাংলাদেশ। বিশেষ করে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল হবে সবচেয়ে বিপর্যস্ত এবং দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল অঞ্চল সম্পূর্ণ পানির নীচে তলিয়ে যেতে পারে। আর তা হলে এ অঞ্চলে শুধুমাত্র সুপেয় পানির দুষ্প্রাপ্যতা বাড়বে না বরং এ অঞ্চলের জনগণের জীবনযাত্রা মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হবে।

জাতীয় পানি নীতির যে সকল ধারা সুপেয় পানির সঙ্গে সম্পর্কিত সেগুলোর বিশ্লেষণ একান্ত প্রয়োজন। বিশেষ করে ৪.১ নদী অববাহিকা ব্যবস্থাপনা, ৪.২ পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা, ৪.৩ পানির অধিকার ও বণ্টন, ৪.৬ পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, ৪.৮ পানি ও শিল্প, ৪.১২ পরিবেশের জন্য পানি এ ধারাগুলো সুপেয় পানির সাথে সম্পর্কিত। তাই এ ধারাগুলোর বিশ্লেষণ প্রয়োজন। তাছাড়া জাতীয় প্রেক্ষিতে রচিত এ নীতিমালা দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল অঞ্চলের পানি সমস্যা নিরসনে কতটুকু কার্যকরী তা যাচাই করা দরকার।

ধারা ৪.১-নদী অববাহিকা ব্যবস্থাপনা : এ ধারায় দেশের বিভিন্ন নদী অববাহিকার সমস্যা সমাধানের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। মিয়ানমার, ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল ও চীনের উপর দিয়ে প্রবাহিত নদীসমূহের বিশেষ করে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার মত আন্তর্জাতিক নদী অববাহিকার সমস্যা বিষয়ে প্রতিবেশী দেশসমূহের সঙ্গে যৌথ পরিকল্পনা গ্রহণের উদ্যোগ নেয়ার বিষয়ে বলা হয়েছে যাতে শুষ্ক মৌসুমে পানি প্রবাহ বৃদ্ধি ও বর্ষা মৌসুমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায়। ধারা ৪.১ (ঙ) তে নদীর পানিতে রাসায়নিক ও জৈব দূষণ নিয়ন্ত্রণে প্রতিবেশী দেশ সমূহের সাথে যৌথভাবে কাজ করার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু লবণাক্ততা ইস্যুকে বাদ দেয়া হয়েছে। যদিও এটা স্পষ্ট যে, নদীর পানি প্রবাহ বাড়ানো হলে তা নদীর পানিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করবে কিন্তু খাবার পানিতে লবণাক্ততা সমস্যা কমাতে পারবে না।

ধারা ৪.২-পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা : অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ ধারায় পানি সংক্রান্ত প্রকাশিত সকল সমস্যা সমাধানের (খরা, বন্যা, পানি নিকাশন, নদী ভরাট, নদী ভাঙন জনিত সমস্যা, সমুদ্র ও নদী বক্ষ থেকে ভূমি পুনরুদ্ধার, জীবন, সম্পত্তি, গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো, কৃষি জমি এবং জলাশয় সংরক্ষণ করা) আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে। এ ধারায় নদ-নদীর গতিপথ অনুযায়ী প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে পানি বিজ্ঞানভিত্তিক অঞ্চল সমূহ চিহ্নিত করে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। অথচ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার খাবার পানি লবণাক্ততামুক্ত করার বিষয়ে কিছু উল্লেখ করা হয়নি।

৪.৩ পানির অধিকার ও বণ্টন : এ ধারায় বলা হয়েছে পানির মালিকানা রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত এবং পানির সুষম বণ্টন, দক্ষ উন্নয়ন ও ব্যবহার এবং দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে সরকার সুষ্ঠু বণ্টনের অধিকার রাখে। ৪.৩ এর (খ) তে সংকটকালীন সময়ে ঘাটতি অঞ্চলে গার্হস্থ্য ও পৌর ব্যবহারের জন্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পানি বণ্টনের কথা বলা হয়েছে। এ ধারায় নদীর পানিতে লবণাক্ততা প্রশমন ও লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনার কথা বলা হলেও গ্রাম এলাকার খাবার পানিতে লবণাক্ততা সমস্যার কথা উল্লেখিত হয়নি।

৪.৬ পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা : এ ধারায় দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল অঞ্চলে সমুদ্র থেকে লবণাক্ততা ভূমির গভীরে প্রবেশ করে ভূ-গর্ভস্থ পানিকে ব্যবহারের অযোগ্য করে তোলার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে এবং তা মোকাবেলা করার বিষয়ে ৪.৬ এর (ক) তে "বৃষ্টির পানি সংরক্ষণসহ বিভিন্ন উপায়ে নিরাপদ সহজলভ্য খাবার পানির সুষ্ঠু যোগান নিশ্চিত করতে সহায়তা দান" এবং ৪.৬ এর (খ) তে "ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর রক্ষা ও বৃষ্টির পানি ব্যবস্থাপনার জন্য প্রধান প্রধান নগর এলাকায় প্রাকৃতিক জলাশয় সংরক্ষণের বিষয়ে বলা হয়েছে, অথচ গ্রামাঞ্চলে কিভাবে লবণাক্ততামুক্ত খাবার পানির সরবরাহ পাওয়া যাবে তার বিষয়ে সুস্পষ্ট কোন বক্তব্য নেই।

৪.৮ পানি ও শিল্প : এ ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে "দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে পানির মাত্রাতিরিক্ত লবণাক্ততা শিল্পে প্রবৃদ্ধির একটি প্রধান প্রতিবন্ধক"। অথচ খুবই আশ্চর্যের বিষয় এ ধারায় পানি দূষণ রোধের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপের বিষয়ে উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও এখানে লবণাক্ততা সমস্যা দূরীকরণের বিষয়টি গুরুত্ব পায়নি।

৪.১২ পরিবেশের জন্য পানি : এ ধারায় বলা হয়েছে "... জাতীয় পানি সম্পদের অব্যাহত উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার আওতায় পরিবেশ ও তার জীববৈচিত্র্য ধারণ, সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।" এ ধারায় কৃষি জমিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি ও লোনাপানি অনুপ্রবেশের কারণে পরিবেশ সমস্যার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ৪.১২ এ (গ) তে উপকূলীয় নদীর মোহনায় পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার জন্য পানির চ্যানেল সমূহে উজান অঞ্চল থেকে পর্যাপ্ত পানি প্রবাহ নিশ্চিত করা এবং ৪.১২ এর (ঘ) তে ক্ষতিগ্রস্ত হ্রদ, পুকুর, বিল, খাল, জলাধার প্রভৃতির মত প্রাকৃতিক জলাশয়কে অবক্ষয় থেকে রক্ষা এবং তার কার্যকারিতা পুনরুদ্ধারের কথা বলা হয়েছে। অথচ খাবার পানির উৎস নলকূপের পানিতে লবণাক্ততার মাত্রা নিয়ন্ত্রণের বিষয় আলোচিত হয়নি।

তাই বলা যায় দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় এলাকাবাসীর জলবায়ু পরিবর্তনজনিত খাবার পানি সংকটসহ পানি সংক্রান্ত বিভিন্ন সংকট কিভাবে মোকাবেলা করবে সে বিষয়টি জাতীয় পানি নীতিমালায় যেমন উপেক্ষিত হয়েছে, তেমনি খাবার পানি সংক্রান্ত ৬টি ধারাতে ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত লবণাক্ত এলাকায় কিভাবে সাধারণ মানুষের খাবার পানি সংকট দূর করা হবে সে বিষয়টি বিবেচিত হয়নি। ৪.৬ ধারায় শহর এলাকায় পানি সরবরাহের বিষয় কিছু উল্লেখ করা হয়েছে অথচ সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের আবাসস্থল গ্রামীণ জনপদের লবণমুক্ত খাবার পানি সরবরাহের ব্যাপারে কোন কথা বলা হয়নি। সেকারণে বলা যায় নীতিমালা প্রণয়নকারীরা গ্রামীণ জনপদের মানুষের চাহিদাকে বিবেচনায় নিয়ে আসেনি।

খ) জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি ২৫ বছরের জন্য তৈরী করা হয়েছে। প্রতি ৫ বছর পর পর এ পরিকল্পনা পুনঃমূল্যায়ন করা হবে। মূলতঃ পানি সংক্রান্ত বিদ্যমান সমস্যাসমূহ দূর করে পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের জীবন মানের উন্নয়নের লক্ষ্যে এ দীর্ঘমেয়াদী পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা রচিত হয়েছে। বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রণীত পরিকল্পনার মধ্যে এটি সর্ববৃহৎ প্রকল্প।

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের খাবার পানিতে লবণাক্ততা সমস্যা বিষয়ে দীর্ঘমেয়াদী সমাধান অনুসন্ধানের বিষয়টি জাতীয় পানি নীতি এবং জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাতে অবহেলিত হয়েছে। শুধুমাত্র পানি ব্যবস্থাপনা নীতিতে খুলনা শহরে সুপেয় পানি সরবরাহের বিষয়টি বিবেচনায় আনা হয়েছে। ২৫ বছর মেয়াদী পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা নীতির প্রথমেই দেশের বিভিন্ন চাহিদা মেটানোর জন্য ৮০ টিরও বেশী কর্মসূচী চিহ্নিত করা হয়েছে। এ কর্মসূচীসমূহ বিভিন্ন শ্রেণীতে সন্নিবেশিত করে উপস্থাপিত হয়েছে। নীতিমালায় বলা হয়েছে জরুরী ভিত্তিতে প্রধান প্রধান নদীগুলোর উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের উন্নত জীবন যাপনের জন্য পানিতে সকলের নিরাপদ সম-অধিকার নিশ্চিত করা হবে, যাতে উৎপাদন ও স্বাস্থ্য রক্ষার সকলে নিরাপদ পানি পায়।

আঞ্চলিক ভূ-উপরস্থ পানি বিতরণ নেটওয়ার্ক (MR 007) এর প্রধান কর্মসূচী হলো নদীর প্রবাহ বাড়ানো (AW 005 এর সাথে সম্পর্কযুক্ত গড়াই নদীতে পানি বৃদ্ধি বিষয়ক কর্মসূচী)। এতে প্রধান তিনটি সংযুক্তি খালের প্রস্তাব করা হয়েছে। বলা হয়েছে লবণাক্ততা নিয়ন্ত্রণের উপযোগী করে খালগুলিকে বিন্যস্ত করা হবে। অভিন্ন নদীসমূহের পানি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ-ভারত সহযোগিতা বজায় রাখা এবং আরো বৃদ্ধি করার কথা বলে এ বক্তব্যে আরো গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের গভীর ও অগভীর ভূ-গর্ভস্থ পানির জলাধারের লবণাক্ততা সমস্যা নিরসনে পরিকল্পনাকারীগণ নীরব থেকেছেন।

শহর এবং গ্রাম এলাকার জন্য গৃহীত প্রকল্পসমূহের অগভীর ভূ-গর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকের বিষয়টি যথাযথ গুরুত্ব পেয়েছে। যদিও লবণাক্ততা খাবার পানিকে পানের অযোগ্য করে, তবুও এখানে খাবার পানিতে লবণাক্ততা বিষয়টি আবারো উপেক্ষিত হয়েছে। নীতিমালায় শহর এবং গ্রামের জন্য গৃহীত জরুরী পদক্ষেপসমূহে বলা হয়েছে "... গ্রাম ও শহর এলাকায় সুপেয় এবং নিরাপদ পানি সরবরাহের চাহিদা ৯২ শতাংশ ইতিমধ্যে পূরণ করা হয়েছে ...।" নীতিমালায় উচ্চ মাত্রার এ সফলতার কথা উল্লেখ করে খাবার পানিতে শরীরের জন্য ক্ষতিকর আর্সেনিক দূষণ ও লবণাক্ততার বিষয়টি এ পরিকল্পনায় নিশ্চিতভাবে অবমূল্যায়ন করা হয়েছে।

গ্রামীণ আর্সেনিক দূরীকরণ কর্মসূচী (RAMP) এর আওতায় (TR 002 তে) বলা হয়েছে "... বিভিন্ন উপায়ে নিরাপদ খাবার পানির প্রাপ্যতা বাড়বে।" এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রকল্পের সফলতা বিষয়ে বক্তব্যে বলা হয়েছে " ... গ্রামের অধিবাসীদের জন্য ১০০ ভাগ আর্সেনিকমুক্ত সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা হবে ... "। এ বিচ্যুতি থেকে এটা পরিষ্কার যে, এ কর্মসূচী সমূহে লবণাক্ততামুক্ত সুপেয় পানির বিষয়টি কখনও বিবেচিত হয়নি।

বড় ও ছোট শহরে পানি সরবরাহ ও বণ্টন পদ্ধতির (LSTWSD) আওতায় (TR 003 তে) লবণমুক্ত পানি পাবার উপায় হিসেবে গভীর নলকূপ (DTW) এর ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। এ উপায়ে প্রত্যেক শহরে ৯০ ভাগ জনগণকে পাইপ লাইনের মাধ্যমে খাবার পানি সরবরাহ করা হবে। জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত ৭নং দলিল অনুসারে সমগ্র দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে অগভীর সুপেয় পানির আধার থেকে ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের খুব কম সুযোগ আছে। এখানে তাই বিতর্ক আসতে পারে পানির প্রাপ্যতার এতো বেশী সমস্যা নিয়ে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের জেলাগুলোতে এ প্রকল্প কি করে ফলপ্রসু হবে?

গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও বন্টন পদ্ধতি (RWSDSP) এর আওতায় (TR 004 তে) লবণাক্ততা ইস্যুটি সত্যিই কি উল্লেখিত হয়েছে ? এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে " ... এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে ... পানি সরবরাহ সেবার উন্নয়ন ঘটানো ... বিভিন্ন এলাকায় হস্তচালিত নলকূপ (HTWs) দ্বারা পানি সরবরাহ করা হয়েছে এবং সে ভাবে ২০০৫ সালের মধ্যে সরবরাহ বাড়িয়ে ১০০ ভাগ সুপেয় পানির চাহিদা নিশ্চিত করা হবে ...।" এটা স্পষ্ট নয় যে, হস্তচালিত নলকূপ প্রকল্প অগভীর লবণাক্ত জলাধার থেকে পানি উত্তোলন করে কিভাবে পানি সরবরাহের বাড়তি চাহিদা পূরণ করবে ? যেখানে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের অধিকাংশে অগভীর জলাধারগুলি আর্সেনিক দ্বারা দূষিত ও লবণযুক্ত। এ কর্মসূচীতে খুলনা শহরের পানি সরবরাহ ও বন্টন প্রকল্পে (MC 004) খুলনা শহরের জন্য সুপেয় পানির ক্ষেত্রে লবণাক্ততার কথা উল্লেখ করা হয়নি। যদিও গভীর নলকূপ খননের মাধ্যমে ২০১০ সালের মধ্যে শহরের ১০০ ভাগ জনগণের সুপেয় পানির চাহিদা পূরণ করা হবে বলে দাবী করা হয়েছে। তাছাড়া এ প্রকল্প সফল বাস্তবায়নের জন্য ৭৮৭.৯ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে। কিন্তু ভূ-গর্ভস্থ গভীর জলাধারে যথেষ্ট পানির জৈবশারীরিক পর্যাপ্ততা বিষয়ে প্রয়োজনীয় সঠিক অনুসন্ধান ছাড়াই কিভাবে এ চাহিদাপত্র তৈরী করা হলো। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প সমূহে খাবার পানিতে লবণাক্ততার বিষয়টির উল্লেখ হয়নি।

জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের লবণাক্ততা প্রশমনের জন্য যেসব প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে তার বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নে ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো ঃ

প্রকল্পের কোড	দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের জন্য আনুমানিক বরাদ্দ (কোটি টাকা বাংলাদেশী)	লবণাক্ততা সম্পর্কিত বরাদ্দ (কোটি টাকা বাংলাদেশী)
MR007	৮৯১.১	শুষ্ক মৌসুমে গঙ্গা অববাহিকা এলাকার নদীর পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি
TR 003	৪৪০৫.৫ (জাতীয় ভাবে, কিন্তু দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল অঞ্চলের জন্য সুনির্দিষ্ট নয়)	তাই সুনির্দিষ্ট কোন বরাদ্দ নেই
TR 004	৭৪২৩.৪ ঐ	সুনির্দিষ্ট কোন বরাদ্দ নেই। শুধুমাত্র পিএসএফ এবং বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের জন্য বরাদ্দ ১.১
MC 004	৭৮৭.৯	শুধুমাত্র খুলনা সিটিতে সুপেয় পানি সরবরাহ
EA 006	৬০	কোন বরাদ্দ নেই
EA 009	২৫.০	কোন বরাদ্দ নেই

বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ২৫ বছর মেয়াদী যে পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা করা হয়েছে সেখানে ৬টি প্রকল্প দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল অঞ্চলে বিদ্যমান পানি সংকট নিরসনের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্প সমূহের একটি বাদে কোনটি দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের বিদ্যমান পানি সংকটের আলোকে গ্রহণ করা হয়নি। শুধুমাত্র খুলনা শহরের জন্য গৃহীত MC004 খুলনা শহরের পানি সমস্যা সমাধানের জন্য গৃহীত। এ প্রকল্পটিও ভূ-গর্ভস্থ গভীর জলাধারে যথেষ্ট পানির জৈবশারীরিক পর্যাপ্ততা বিষয়ে প্রয়োজনীয় সঠিক অনুসন্ধান ছাড়াই তৈরী করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রকল্পসমূহে খাবার পানিতে লবণাক্ততার বিষয়টির উল্লেখ হয়নি। এ প্রকল্পগুলো জাতীয় প্রেক্ষিত বিবেচনায় রেখে তৈরী করা হয়েছে। জাতীয় প্রেক্ষিত থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল অঞ্চলের প্রেক্ষিত সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাই জাতীয় প্রেক্ষিতের আলোকে রচিত এ প্রকল্প থেকে এ অঞ্চল উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা কম।

গ) জাতীয় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন নীতিমালা

লবণাক্ততা ইস্যুটি জাতীয় পানি নীতিতে যথাযথভাবে চিহ্নিত হয়নি। অনেকে আশা করেছিল জাতীয় পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন নীতিমালা (National Safe Water Supply And Sanitation Policy) তে ইস্যুটি গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হবে। কিন্তু এ নীতিমালায় ইস্যুটি পুনরায় উপেক্ষিত হয়েছে।

নীতিমালার মৌলিক চাহিদা অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে "জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য পানি সরবরাহ এবং পয়ঃনিষ্কাশন সেবা উন্নত ও প্রসারিত করা প্রয়োজন।" দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বসবাসরত জনগণের মৌলিক চাহিদা হলো লবণাক্ততামুক্ত বিশুদ্ধ খাবার পানি। যদিও নীতিমালায় মৌলিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে পানি সরবরাহের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে কিন্তু কোথাও যথাযথভাবে লবণমুক্ত খাবার পানি সরবরাহের বিষয়টি যুক্ত করা হয়নি।

প্রযুক্তি নির্বাচনের (technology option) নীতিমালায় বলা হয়-"বিশেষ এলাকার চাহিদা অনুযায়ী পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন-এর সুবিধার্থে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখা হবে। নীতিমালায় কোথাও নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি কোন ধরনের প্রযুক্তি লবণাক্ততামুক্ত পানীয় জল সরবরাহে কাজে লাগানো হবে (ব্যবহার করে সুবিধা পাওয়া যাবে) এবং কিভাবে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের চাহিদা পূরণ করা হবে।

জাতীয় পানি সংক্রান্ত নীতিমালার বিনিয়োগ সংক্রান্ত ধারাতে বলা হয়েছে "দুর্বলতাগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিহ্নিত করা জরুরী" দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের লবণমুক্ত পানির উৎস অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে পূর্বে তেমন কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। তাই নিশ্চিতভাবে বলা যায় যথাযথ দিক নির্দেশনার অভাবে জাতীয় পানি নীতি ও জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা নীতিমালায় উল্লেখিত প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়টি কখনও বাস্তবায়িত হবে না।

জাতীয় পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন নীতিমালা-এর ৮নং ধারায় বর্ণিত নীতির মধ্যে চারটি উপাদান। ৮.১.১নং উপ ধারায় বলা আছে খাবার পানি সরবরাহের দায়িত্বভার সমাজের উপর। অনুমান করা যায় লবণ আক্রান্ত অঞ্চলের ক্ষেত্রে এটা সত্য। কিন্তু আশ্চর্যজনক বিষয় যে রাষ্ট্র ও তার প্রশাসন যেখানে খাবার পানিতে লবণাক্ততা ইস্যু উপস্থাপন করতে ভীত সেখানে সমাজের ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের এ সম্পর্কে দায়ভার নেবার কি সুযোগ আছে? তাছাড়া শহর ও গ্রামাঞ্চলের জন্য একই নীতিমালা। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের লবণমুক্ত খাবার পানির জন্য নীতিমালায় সুনির্দিষ্ট কোন দিক নির্দেশনা নেই। এটা দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের জনগণের জন্য একটা বড় রকমের গ্রহসন। এ গ্রহসন দ্রুত সংশোধনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

ঘ. উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা (খসড়া)

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের লবণাক্ততা দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত। যদিও উপকূলবর্তী অঞ্চলের জন্য কোন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নেই, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় উপকূলবর্তী অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে এগিয়ে এসেছিল। মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি খসড়া নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। উপকূলীয় অঞ্চল নীতিমালার সংশোধিত খসড়া বর্ণনায় দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে সরকারের বিভিন্ন শাখার মাঝে সমন্বয় এবং শাখা অনুযায়ী সমন্বয় নিশ্চিত করে উপকূল অঞ্চলের উন্নয়নে সম্মিলিত ব্যবস্থাপনার কথা উল্লেখ করা হয়।

এ খসড়া নীতিমালায় উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনার (CZM) উদ্দেশ্য তুলে ধরে বলা হয়েছে 'জীবিকা চালিয়ে যাওয়া, দারিদ্র্য হ্রাস করা এবং উপকূল অঞ্চলকে জাতীয় মূলধারার (Mainstream) সাথে যুক্ত করার ক্ষেত্রে এ নীতিমালা একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করবে।

খসড়া-নীতিমালার শুরুর দিকে উপকূল অঞ্চলের বাস্তবতা/পরিবেশ সম্পর্কে বলা হয় 'Water .....salinity as hazards', যদিও এটা খাবার পানিতে লবণাক্ততা সম্পর্কে বিশেষিত নয়, তবুও শুরুতেই পানির কথার উল্লেখ প্রত্যাশা জাগিয়ে তোলে যে লবণাক্ততার বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে আলোচিত হবে।

এ নীতিমালা ৮টি বিশেষ উদ্দেশ্যের সাথে পানীয়জলে লবণাক্ততা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি দৃঢ়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় এর লক্ষ্য "উপকূল অঞ্চলের মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ করা....." যদি সুপেয় পানিকে মানুষের মৌলিক চাহিদার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান মনে করা হয় তাহলে এ উপেক্ষিত বিষয়টির প্রতি দৃষ্টিপাত প্রয়োজন।

এ নীতিমালার বিশেষ উদ্দেশ্য ৩য় অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ৩.১ অধ্যায়ে বলা হয়েছে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান করা হবে। এটাও প্রত্যাশা করা হয়েছে নিশ্চিতভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দারিদ্র্য দূরীকরণে সহায়ক হবে। কিন্তু বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কখনই দরিদ্রমুখী নয়। তাই যদি দারিদ্র্য দূর করার উপযুক্ত কাঠামো গড়ে তোলা না হয় তাহলে কেবল মাত্র বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূর করা যাবে না। আর দরিদ্রদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিকভাবে লবণমুক্ত খাবার পানি প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করা না গেলে তাদের পক্ষে লবণমুক্ত সুপেয় পানি সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়ে উঠবে না।

৩.২ ধারায় বিশুদ্ধ পানীয়জল সরবরাহের জন্য ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। প্রশ্ন থেকে যায় বিশুদ্ধ পানীয়জল বলতে লবণাক্ততা মুক্ত পানিকে বোঝানো হয়েছে কিনা অথবা লবণাক্ততাকে আদৌ দূষিত পানি হিসেবে মনে করা হয়েছে কিনা। যদি অতিমাত্রায় লবণাক্ততা পানীয় জলকে দূষিত করে বলে বিবেচনা করা হয় তাহলে এ নীতিমালা সমস্যা সমাধানে নিশ্চিতভাবে সহায়ক হবে।

৬. বাস্তবায়িত সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ

যদি বর্তমান পর্যন্ত গৃহীত বিভিন্ন সরকারী নীতিমালা ও পরিকল্পনায় বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল অঞ্চলে লবণাক্ত এলাকা সম্প্রসারণের প্রেক্ষিতে সৃষ্ট খাবার পানির সংকট নিরসনের জন্য সরকার স্বতন্ত্র কোন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেনি, তবে সারাদেশে খাবার পানি সরবরাহের কর্মসূচীর অংশ হিসেবে এ অঞ্চলেও পানি সরবরাহের উদ্যোগ বাস্তবায়িত হয়েছে। সরকারী উদ্যোগে বিভিন্ন এলাকায় গভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে এবং যে অঞ্চলে নলকূপ সফল নয় সেখানে কিছু পিএসএফ স্থাপন করা হয়েছে। উপকূলীয় অঞ্চলের সুপেয় পানির তীব্র সংকট মোকাবেলায় বিভিন্ন সময় বেসরকারীভাবেও বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যদিও সমস্যার আকার ও পরিধির তুলনায় সে সকল উদ্যোগ যথেষ্ট নয়। বেসরকারী পর্যায়ে সুপেয় পানির সহজলভ্যতা সৃষ্টি করার জন্য কিছু কিছু এলাকায় PSF নির্মাণ, পুকুর খনন ও বৃষ্টির পানি সংগ্রহের মত কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। উত্তরণ ১৯৯০ সাল থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত মেননাইট সেন্ট্রাল কমিটি (MCC)-এর সঙ্গে যৌথভাবে বেশকিছু অতি অগভীর নলকূপ (VSST) স্থাপন করে। কিন্তু প্রায় ৫০ লক্ষ অধিবাসীর দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলের এ জনপদের জন্য এসব পদক্ষেপ এ অঞ্চলের সুপেয় পানির চাহিদার তুলনায় খুবই নগণ্য।

৭. লবণমুক্ত সুপেয় পানির সম্ভাব্য উৎস

বর্তমানে উত্তরণ স্থায়ীভাবে সুপেয় পানিতে জনগণের অভিগম্যতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করছে। এরই অংশ হিসেবে উত্তরণ মাঠ পর্যায়ে PRA, FGD, প্রশ্নমালাভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ, ডায়াগোনষ্টিক স্টাডি, বিভিন্ন থানা পর্যায়ে পানি সংকটের কারণ, জনজীবনে-এর প্রভাব ও বিকল্প উৎস অনুসন্ধানের জন্য স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, বিশিষ্ট ব্যক্তি, শিক্ষক, সাংবাদিক, মুক্তিযোদ্ধা, মহিলা সদস্য, মসজিদের ইমাম, এনজিও কর্মী, সরকারী কর্মকর্তা ও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মহিলাসহ ভুক্তভোগী জনগণের সমন্বয়ে কর্মশালা, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, Department of Public Health & Engineering, এনজিও

ফোরামসহ বিভিন্ন অভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের সাথে যথেষ্ট মত বিনিময় করেছে এবং তারই আলোকে সম্ভাব্য সুপেয় পানির উৎসগুলোর তালিকা এবং পানি সংগ্রহের কৌশল সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ তৈরী করেছে। নিম্নে এগুলোর বিবরণ দেওয়া হলো–

উৎসগুলির বিবরণ

দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল এলাকায় সুপেয় পানির দুষ্প্রাপ্যতা সত্ত্বেও ইতিমধ্যে জনগণের অভিজ্ঞতা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তৎপরতা এবং উত্তরণ-এর গবেষণার আলোকে সুপেয় পানির কিছু উৎসাহব্যাঞ্জক উৎসের সন্ধান পাওয়া গেছে। যার কিছু অংশ এখনও ব্যবহার শুরু হয়নি বা এখনও ব্যবহার উপযোগী কৌশল তৈরী করা সম্ভব হয়নি। স্থানীয়ভাবে এ সুপেয় পানির উৎসসমূহকে ২ ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

ক) ভূ-উপরস্থ সুপেয় পানি।
খ) ভূ-অভ্যন্তরস্থ সুপেয় পানি।

ক) ভূ-উপরস্থ সুপেয় পানি

অতীতে আমাদের দেশের অধিকাংশ জনগণ ভূ-উপরস্থ পানি পান করতেন। আমাদের দেশে খাবার পানি হিসেবে ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয় প্রায় তিন দশক পূর্বে। এ সময়ে ডায়রিয়া, কলেরা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমাদের দেশের জনগণকে নলকূপের পানির উপর নির্ভরশীল করে তোলা হয়েছে। বর্তমানে আমাদের দেশের নলকূপের পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতি এক মারাত্মক দুর্যোগের সৃষ্টি করেছে। এখন সময় এসেছে আবার পুরোনো অভ্যাসে ফিরে যাবার অথবা ভূ-অভ্যন্তরস্থ নিরাপদ পানির সন্ধান ও তার ব্যবহার করার।

ভূ-উপরস্থ নিরাপদ খাবার পানির যেসব উৎসের সন্ধান পাওয়া যায় পরবর্তী পৃষ্ঠায় সেসব উৎসগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো ঃ

১. কূয়া বা ইঁদারা

বাংলাদেশে কূয়া বা ইঁদারা প্রচলিত পানীয় জলের উৎস। অনেক দেশেই মানুষ পানীয় জলের জন্য কূয়া বা ইঁদারার উপর নির্ভর করে। মাটির কয়েকটি স্তর পার হওয়ার সময় পানি প্রাকৃতিক উপায়ে শোধন হওয়ার পর কূয়ার তলায় জমা হয়। ১৯৯৭ সালে ইউনিসেফ কর্তৃক প্রকাশিত "প্রগতির পথে" পুস্তকে উল্লেখ করা হয় পাতকূয়া বা ইঁদারার জল নিরাপদ।

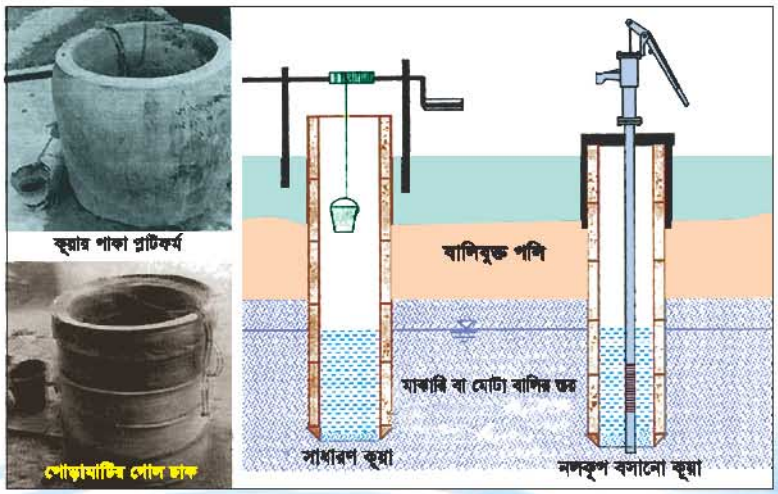

ব্যবহারকারীদের বিবেচনায় কূয়ার জল সুপেয়। এ পানি আর্সেনিকমুক্ত। সাধারণতঃ একটি কূয়া থেকে ২০ জন মানুষের দৈনন্দিন পানির চাহিদা মেটানো সম্ভব। তবে আকার বড় হলে একটি ইঁদারা ৫০ জনের দৈনন্দিন চাহিদা পূরণে সক্ষম। পাকা প্লাটফর্ম ও ড্রেনসহ একটি কূয়া তৈরী করতে সর্বোচ্চ ১৫ হাজার টাকা খরচ হয়।

মাটিতে গর্ত করে ২-২.৫ ফুট ব্যাসের পোড়ামাটির গোল চাকা একটির উপরে আর একটি বসিয়ে কূয়া তৈরী করা হয়। কূয়ার গভীরতা সাধারণতঃ ৩০ থেকে ৩৬ ফুট হয়। ইটের গাঁথুনি, আরসিসি চাক বা রিং বসিয়ে ইঁদারা তৈরী করা যায়। কোন কোন ইঁদারার গর্ত ৪০ - ৪৫ ফুট এবং ব্যাস ৩-১০ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে।

বছরে একবার তলানী পরিষ্কার করে একটি কূয়া বা ইঁদারা সহজে ৫০ বছর ব্যবহার করা যায়। কূয়ার পানি দূষণমুক্ত তবে কূয়ার পানিতে যাতে কোন রোগজীবাণু না মেশে ময়লা আবর্জনা না পড়ে সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। বিশেষ করে পায়খানা বা বাড়ীর ময়লা আবর্জনা ফেলার গর্ত থেকে দূরে নিরাপদ উঁচু জায়গায় কূয়া তৈরী করতে হয়। কূয়ার আশেপাশে লবণ পানি থাকলে কূয়ার পানি লবণাক্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কূয়ার উপরে স্থায়ীভাবে ঢাকনা দিয়ে এবং কূয়ার পানিতে নলকূপ সংযোগ করে পানি ব্যবহার করাই সবচেয়ে নিরাপদ।

মাটির মটকায় বৃষ্টির পানি সংগ্রহ

বৃষ্টির পানি সংগ্রহের জন্য নির্মিত পাকা ট্যাংক

২. বৃষ্টি থেকে সংগৃহীত পানীয় জল

পানীয় জল হিসেবে বৃষ্টির পানি সম্পূর্ণ নিরাপদ। বৃহত্তর খুলনা জেলার অধিকাংশ এলাকার মানুষ মাটির উপরের ও নীচের পানি লবণাক্ততার কারণে পান করতে পারে না। বৃষ্টির পানি এসব অঞ্চলের সুপেয় পানির বিকল্প উৎস হতে পারে। টিনের বা টাইলসের তৈরী ঘরের চাল ও দালানের ছাদ থেকে বৃষ্টির সময় পানি সংগ্রহ করা যায়। খড়ের চাল থেকে সংগৃহীত বৃষ্টির পানি নিরাপদ নয়। তবে খড়ের চালের উপর পলিথিনশিট বিছিয়ে দিয়ে বৃষ্টির পানি সংগ্রহ করলে সে পানি পান করা যাবে। বাংলাদেশে সাধারণত বৃষ্টির মৌসুম ২-৩ মাস স্থায়ী থাকে, এ সময় একটি পরিবার সরাসরি বৃষ্টির পানি দিয়ে খাবার পানির চাহিদা মেটাতে পারে। বাকি ৯ মাস যদি ঐ পরিবার ১০ হাজার লিটার পানি সংগ্রহ করে রাখতে পারে, তবে পরিবারটির সারা বছরের খাবার পানির চাহিদা পূরণ হয়। ১০ হাজার লিটার পানি সংরক্ষণের জন্য একটি ট্যাংক, প্লাষ্টিকের পাইপ, টুয়া ও অন্যান্য উপকরণের প্রয়োজন। এর জন্য খরচ হবে মোট ১২,৫০০ টাকা। বার্ষিক মেরামত খরচ হবে বছরে সর্বোচ্চ ২০০ টাকা।

এ পদ্ধতিতে সংগৃহীত পানি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কিছু অসুবিধাও দেখা দিতে পারে। সংগ্রহ করার পদ্ধতি সঠিক না হলে দীর্ঘদিন পানি সংগ্রহে রাখার ফলে কিছু ব্যাকটেরিয়া এবং এক ধরনের পোকার জন্ম হতে পারে। সে ক্ষেত্রে ভয়ের কোন কারণ নেই। অতিরিক্ত সতর্কতা হিসেবে এ পদ্ধতির সাথে কলস বা চারকল ফিল্টার বা ছোট বালুর ফিল্টার ব্যবহার করতে হবে।

৩. বালির ফিল্টার দিয়ে পুকুরের পানি শোধন বা Pond Sand Filter (PSF) পদ্ধতি

যেসব এলাকায় মাটির নীচে নলকূপ বসানোর জন্য মোটা দানার পলি বা বালির পুরু স্তর পাওয়া যায় না এসব এলাকার মানুষের সুপেয় পানির চাহিদা পূরণের জন্য PSF ব্যবহার করা যেতে পারে। এ পদ্ধতিতে সংরক্ষিত পুকুরের পানি বালুর তৈরী ফিল্টার বা PSF এর মাধ্যমে শোধন করে পান করা যায়। ইউনিসেফ ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ আশির দশক থেকে বাংলাদেশে লবণাক্ত এলাকায় পুকুরের পানি শোধনের জন্য কিছু PSF তৈরী করেছে। PSF এ পানির উৎস হিসেবে একটি সংরক্ষিত পুকুর ব্যবহার করা হয়। পুকুরের পাড়ে PSF তৈরী করতে সর্বোচ্চ ২৫ হাজার টাকা খরচ হয়। বাৎসরিক রক্ষণাবেক্ষণ খরচ সর্বোচ্চ ৬০০ টাকা। এ পদ্ধতিতে পানির উৎস ২৪ ঘন্টাই ব্যবহারযোগ্য। কমপক্ষে ২০০টি পরিবার একটি PSF থেকে দৈনিক খাবার পানির চাহিদা পূরণ করতে পারে।

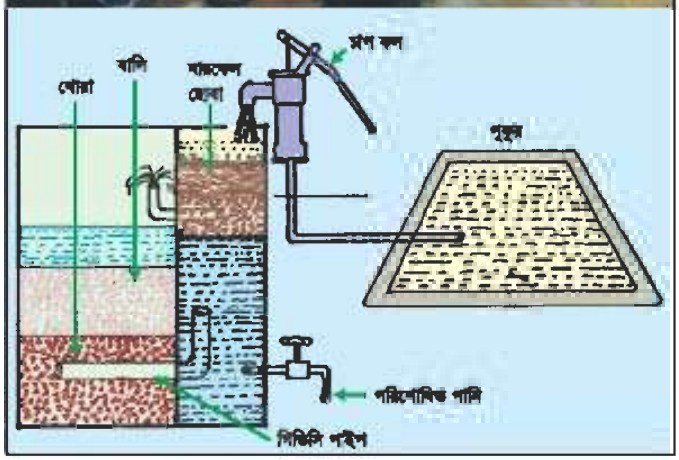

PSF পদ্ধতির পানির উৎস পুকুর সহজে দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যার কারণে পানিবাহিত রোগের প্রকোপ দেখা দিতে পারে। সে জন্য এ উৎসগুলোকে সংরক্ষিত পুকুর হিসেবে দূষণমুক্ত রাখার কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। পুকুরের পাড় উঁচু করে তৈরী করতে হয় যাতে বর্ষা মৌসুমে বাইরের বৃষ্টি ধোয়া নোংরা পানি বা বন্যার পানি ভিতরে ঢুকতে না পারে। পুকুরের সঙ্গে কোন ড্রেন বা পয়ঃপ্রণালীর সংযোগ রাখা যাবে না। পুকুরের চতুর্দিকে কাঁটা তার দিয়ে ঘিরে দিতে হবে যাতে মানুষ বা জীবজন্তু সরাসরি পুকুরের পানি স্পর্শ করতে না পারে। পুকুরে কচুরিপানা, কলমি ইত্যাদি থাকলে তা পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। পুকুরে মাছ চাষ করা যেতে পারে তবে মাছের জন্য অতিরিক্ত খাবার যেমন, গোবর, খৈল বা রাসায়নিক সার ব্যবহার করা যাবে না। পুকুরে গোসল করা বা কাপড় পরিষ্কার করা যাবে না।

PSF পদ্ধতিতে সংরক্ষিত পুকুরের পাশে ইটের গাঁথুনির একটি চৌবাচ্চা তৈরী করতে হয়। যার মধ্যে ৩ টি অসমান প্রকোষ্ঠ থাকে। চৌবাচ্চার উপরে বাইরের দিকে একটি নলকূপ বসিয়ে তার সঙ্গে পাইপ লাগিয়ে তা মাটির ভিতর দিয়ে পুকুরের পানির সাথে সংযুক্ত করতে হয়। চৌবাচ্চার উপরের প্রকোষ্ঠে শুকনো নারকেলের ছোবড়া রাখতে হয়। নলকূপে

চাপ দিলে পুকুরের পানি পাইপের মাধ্যমে এ প্রকোষ্ঠে আসবে এবং এখান থেকে পানির ময়লা পরিষ্কার হওয়ার পর ফিল্টার প্রকোষ্ঠে যায়। সেখানে ফিল্টার হয়ে পানি তৃতীয় প্রকোষ্ঠে যায়। এ প্রকোষ্ঠ থেকে ফিল্টার হওয়া পানি সংগ্রহ করা যায়। চৌবাচ্চাটি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখতে হয়। পদ্ধতিটি অত্যন্ত সহজ ও জটিলতামুক্ত বলে সুপেয় পানির বিকল্প উৎস হিসেবে PSF এর ব্যবহার বাড়ানো যেতে পারে।

৪. কলস ফিল্টার পদ্ধতি

আমাদের দেশে এক সময় পানি শোধনের জন্য কলস ফিল্টার পদ্ধতির ব্যাপক প্রচলন ছিল। এখনও কোন কোন এলাকায় কলস ফিল্টারের ব্যবহার আছে। বিশেষত সংরক্ষিত পুকুর, কূয়া বা ইঁদারার পানির ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করার জন্য এ কলস ফিল্টার পদ্ধতি বেশী কার্যকরী।

কলস ফিল্টার পদ্ধতি

স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য উপাদান যেমন মাটির তৈরী কলস, বালু, খোয়া, জ্বালানী, কাঠের কয়লা দিয়ে এ ফিল্টার তৈরী করা যায়। কলসগুলো একটার পর একটা বসানোর জন্য বাঁশ বা কাঠের ট্যাঙ বানাতে হয়। এটি তৈরী করতে সর্বোচ্চ ৩০০ টাকা খরচ হয়। কলস ফিল্টার পদ্ধতির বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ খরচ নেই বললেই চলে। এ পদ্ধতিতে ২৪ ঘন্টাই ফিল্টার প্রক্রিয়া চালু রাখা যায় এবং এর দ্বারা ৪/৫ জনের একটি পরিবারের দৈনিক বিশুদ্ধ খাবার পানির চাহিদা পূরণ করা সম্ভব।

বাস্তব গুণগতমান, রাসায়নিক গুণগতমান এবং জীবাণুঘটিত দূষণের মান পরীক্ষার ফলাফল হতে দেখা যায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মাত্রা অনুযায়ী কলস ফিল্টারে শোধিত পানি পানযোগ্য। এ পদ্ধতির ক্ষেত্রে কূয়া এবং পুকুর পানির উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কাজেই এ পদ্ধতিতে পানি শোধন করতে হলে পানির উৎস কূয়া কিংবা পুকুরের পানি দূষণমুক্ত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সকল সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

খ) ভূ-অভ্যন্তরস্থ সুপেয় পানি

দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল অঞ্চলে ভূ-অভ্যন্তরস্থ সুপেয় পানি ৩ ভাবে পাওয়া যেতে পারে

১. অতি অগভীর নলকূপ (ডি এস এস টি)

২. মরা নদী, খাল ও চরার ভূ-অভ্যন্তরস্থ জলাধার

৩. গভীর নলকূপ।

খ (১) অতি অগভীর নলকূপ (ভি এস এস টি)

সাধারণত পুকুরের তলদেশে একটি কৃত্রিম অ্যাকুইফার বা জলাধারের সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে যে সকল পুকুরের তলদেশে ২/৩ ফুটের ভিতরে বালু থাকে সেখানে এ কৃত্রিম জলাধার সৃষ্টি হয়ে থাকে। দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল অঞ্চলের অনেক পুকুরের তলদেশে এ ধরনের কৃত্রিম জলাধার আছে। এ জলাধার গুলোর ভিতরে ৩টি স্তর থাকে। এ ৩টি স্তরের প্রথম বা সর্বোপরি স্তর এবং ২য় বা মধ্যম স্তরে থাকে মিষ্টিপানি আর ৩য় বা সর্বশেষ স্তরে সাধারণত থাকে লবণ পানি। মিষ্টিপানির তুলনায় লবণ পানি ভারী বলে তা সর্বশেষ স্তরে সঞ্চিত হয়ে থাকে।

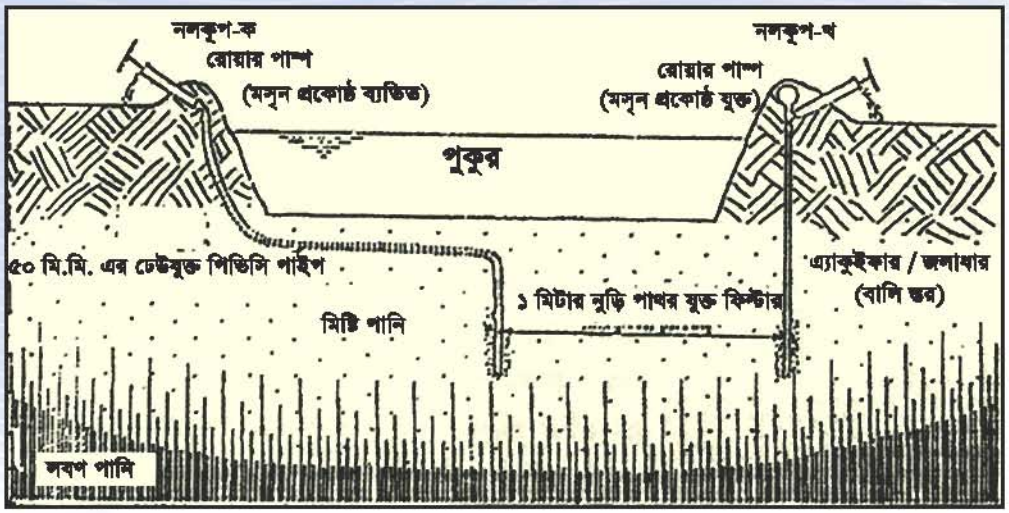

অতি অগভীর নলকূপ (ভি এস এস টি)

প্রথম ও দ্বিতীয় স্তর থেকে ১২ মাস মিষ্টিপানি পাওয়া সম্ভব। তবে শুষ্ক মৌসুমে যদি পুকুর শুকিয়ে যায় তাহলে প্রথম স্তর থেকে শুষ্ক মৌসুমে মিষ্টিপানি পাওয়া সম্ভব হবে না। তাই প্রথম স্তর এবং সর্বশেষ স্তরে নলকূপ না বসিয়ে দ্বিতীয় স্তরে নলকূপ বসানো যুক্তিযুক্ত। এ ক্ষেত্রে নলকূপটি পুকুরের পাশে ২০-৩০ ফুট গভীরতার ভিতরে স্থাপন করতে হবে। এ ধরনের নলকূপ বসানোর ক্ষেত্রে মিস্ত্রী বা সংশ্লিষ্ট কর্মীদের বিশেষ দক্ষতারও প্রয়োজন পড়ে।

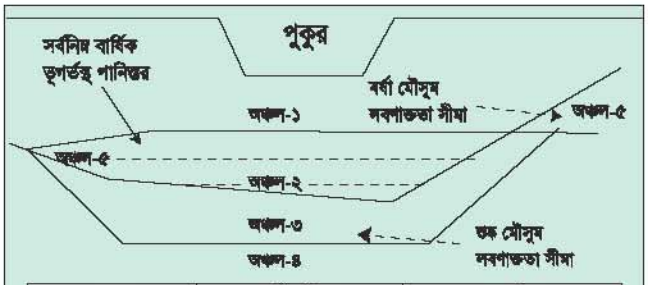

অঞ্চল	বর্ষা মৌসুম	শুষ্ক মৌসুম
১.	মিষ্টি পানি	কোন পানি নেই
২.	মিষ্টি পানি	মিষ্টি পানি
৩.	লবণপানি	মিষ্টি পানি
৪.	লবণ পানি	লবণ পানি
৫.	লবণ পানি	কোন পানি নেই

খ (২) মরা নদী, খাল ও চরার ভূ-অভ্যন্তরস্থ জলাধার

উত্তরণ এ অঞ্চলে সুপেয় পানির সন্ধান করার জন্য বিভিন্ন ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ পরিচালনা করে। জরিপের মাধ্যমে উত্তরণ জানতে পারে যে, গঙ্গা নদীর মূল প্রবাহ এক সময় খুলনা ও ২৪ পরগণার উপর দিয়ে প্রবাহিত হতো এবং তা ৭/৮ টি শাখায় প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হতো। বিভিন্ন প্রাকৃতিক এবং মনুষ্যসৃষ্ট কারণে গঙ্গা নদী তার গতিপথ পরিবর্তন এবং পরবর্তী কালে তার শাখা নদীগুলো বিশেষভাবে মাথাভাঙ্গা নদীর উৎসমুখ বন্ধ হওয়ার প্রেক্ষিতে যশোর, খুলনা, কুষ্টিয়া এবং ভারতের একাংশ মৃত ব-দ্বীপে পরিণত হয়। এর ফলে দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল এলাকায় অসংখ্য নদী-নালা ও চরা পলিমাটি দ্বারা ভরাট হয়ে যায়। এ সকল মৃত নদী-নালা এবং চরায় মোটা দানার বালির আধিক্য থাকায় ভূ-অভ্যন্তরে বিশাল বিশাল সুপেয় পানির জলাধার সৃষ্টি হয়েছে। এ সকল জলাধার খুব সহজেই বৃষ্টির পানি দ্বারা পুনর্ভরণ হয়ে থাকে। তাই এ অঞ্চলের এ সকল জলাধার থেকে সুপেয় পানির চাহিদার একাংশ অতি সহজেই মেটানো যেতে পারে। প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান ও পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে এ সব ভরাট হওয়া মরা নদী, অথবা মৃতপ্রায় নদীর চরার ভূ-অভ্যন্তরস্থ সুপেয় পানি জলাধার চিহ্নিত করে সেখানে নলকূপ বসাতে পারলে তা সুপেয় পানির উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

সুপেয় পানির বিষয়ে উত্তরণের প্রাথমিক তথ্যানুসন্ধান কার্যক্রমের মাধ্যমে জানা যায় সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর থানার মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়নের ১৮টি গ্রামের সকল স্থানে লবণাক্ততার কারণে খাবার পানির তীব্র সংকট ছিল। কিন্তু বর্তমানে নদীর তীরবর্তী চুনকুড়ি, বড় ভেটখালি এবং সিংহটতলী এ ৩ গ্রামের মধ্যে এ ধরনের মিষ্টিপানির জলাধার পাওয়া গেছে। ফলে এ ৩টি গ্রামের মানুষেরা নিজেদের চেষ্টায় ৪৮০-৫০০ ফুট গভীরে নলকূপ বসিয়ে সুপেয় পানির সংকটমুক্ত হয়েছে। অথচ ইউনিয়নের বাকী ১৫টি গ্রামের মানুষ (গ্রামগুলো নদী থেকে বেশ দূরে অবস্থিত) লবণাক্ততার কারণে এখনো সুপেয় পানি সংকটে ভুগছে এবং এদের অধিকাংশই পুকুরের পানি পান করছে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান ও গবেষণা পরিচালিত হলে মরা নদী ও চরার ভূ-অভ্যন্তরস্থ জলাধার সুপেয় পানির দীর্ঘস্থায়ী উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

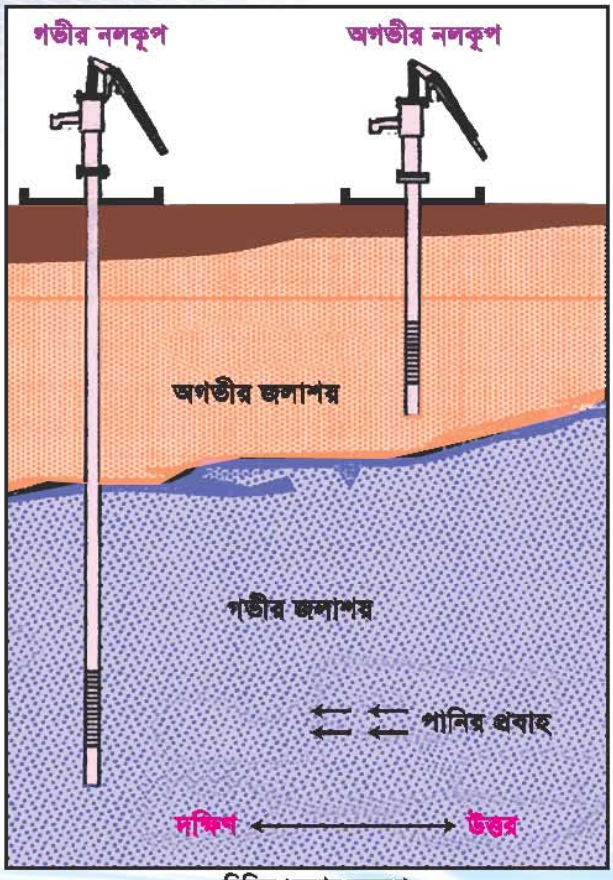

বিভিন্ন ধরণের নলকূপ

খ (৩) গভীর নলকূপ

বাংলাদেশের গভীর নলকূপ সাধারণতঃ ৩০০ থেকে ১২০০ ফুটের মধ্যে হয়ে থাকে। দেশের উত্তরাঞ্চলে ৩০০ থেকে ৪০০ ফুটের মধ্যে গভীর নলকূপ হয়। কিন্তু দেশের দক্ষিণ-

পশ্চিমাঞ্চলে এবং উপকূল এলাকার এ নলকূপের গভীরতা ৭০০ থেকে ১২০০ ফুটের মধ্যে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে এ সকল গভীর নলকূপের পানি তুলনামূলক কম লবণাক্ত এবং আর্সেনিক মুক্ত। তবে পলি মাটি বা চিকন পলির আধিক্য, পাথরের উপস্থিতি এবং অধিক লবণাক্ততা ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে উপকূলীয় সব এলাকায় গভীর নলকূপ স্থাপন করা যায় না। যেহেতু অগভীর নলকূপগুলো আর্সেনিক আক্রান্ত সেহেতু বিজ্ঞানসম্মতভাবে গভীর নলকূপ বসাতে হবে। অন্যথায় অগভীর স্তর থেকে আর্সেনিকযুক্ত পানি গভীর স্তরে মিশে পানিকে দূষিত করতে পারে। এ উপকূল এলাকায় ভূ-গর্ভে মিষ্টিপানির জলাধারের সংখ্যা কম এবং জলাধারে পানির পরিমাণও সীমিত। তাই এ পানির যথাযথ বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

৮. দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল অঞ্চলের সুপেয় পানি সমস্যার স্থায়ী সমাধান

এ অঞ্চলের সুপেয় পানি সমস্যার স্থায়ী সমাধান, সুন্দরবন ও তার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং প্রচলিত কৃষি ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার জন্য মিষ্টিপানির প্রবাহ বৃদ্ধি করা ছাড়া বিকল্প কোন উপায় নেই। এর পাশাপাশি এলাকার ভূ-গর্ভস্থ জলাধারসমূহের পানি বিজ্ঞানসম্মতভাবে ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। তাছাড়া সুপেয় পানির ভূ-উপরস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ সকল সম্ভাব্য উৎস অনুসন্ধান করে প্রাপ্ত উৎস ব্যবহার উপযোগী নূতন নূতন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের উদ্যোগ নিতে হবে। মিষ্টিপানির প্রবাহ বৃদ্ধির একমাত্র উপায় গঙ্গার বর্তমান প্রবাহের (পদ্মা) সঙ্গে এ অঞ্চলের নদীগুলোর পুনঃসংযোগ স্থাপন করা। পুনঃসংযোগ করা সম্ভব হলে মিষ্টিপানির প্রবাহ বাড়বে। তাতে সুপেয় পানির সংকট নিরসন হবার পাশাপাশি নদীসমূহের নাব্যতাও বাড়বে। এ অঞ্চলের পানিতে লবণাক্ততার মাত্রা হ্রাস পাবে। সম্ভাব্য বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পাবে সুন্দরবন ও এ অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য এবং পানি সম্পদ। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান ও গবেষণা হওয়া দরকার। দরকার যথাযথ সরকারী উদ্যোগ।

৯. দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল অঞ্চলের নাগরিক সমাজের দাবী

দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল অঞ্চলের নাগরিকদের সংগঠন 'পানি কমিটি' সুপেয় পানির সংকট নিরসনের দাবীতে আন্দোলন করছে। তারা দীর্ঘদিন যাবৎ উপকূলীয় জলাভূমি সংরক্ষণের লক্ষ্যে কাজ করছে। পানি কমিটি কেজেডিআরপি প্রকল্পকে পরিবেশসম্মত করার দাবীতে আন্দোলন পরিচালনা করে। তাদের দাবীর প্রেক্ষিতে কেজেডিআরপি প্রকল্পের কর্মসূচী পরিবর্তন হয় এবং দাতাসংস্থা জলাবদ্ধতা নিরসনে জনগণের উদ্ভাবিত টিআরএম প্রযুক্তি বাস্তবায়নে সম্মত হয়। বর্তমানে কেজেডিআরপি প্রকল্পের আওতায় বিল কেদারিয়ায় টিআরএম প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে।

পানি কমিটির ৮টি থানা কমিটি (খুলনা জেলার ডুমুরিয়া, পাইকগাছা, কয়রা, সাতক্ষীরা জেলার তালা, দেবহাটা, কালিগঞ্জ, শ্যামনগর, আশাশুনি) গঠিত হয়েছে এবং সকল থানা প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় পানি কমিটি গঠিত হয়েছে। তারা ইতিমধ্যে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল অঞ্চলের মানুষের সুপেয় পানি সমস্য সমাধানের দাবীতে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেছেন এবং সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে একটি দাবীনামা ঘোষণা করেছেন। পানি কমিটির এ দাবীসমূহ দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল অঞ্চলের নাগরিকদের দাবী হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। দাবীসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১) জাতীয় পানি নীতিমালা ও জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় খাবার পানিতে লবণাক্ততার বিষয়টি বিবেচনায় এনে বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

২) জাতীয় নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন নীতিমালায় লবণাক্ততার বিষয়টি সুনির্দিষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং সে অনুযায়ী প্রকল্প বা কর্মসূচী থাকতে হবে।

৩) বর্তমান জাতীয় নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন নীতিমালা অনুযায়ী লবণাক্ততা আক্রান্ত সুপেয় পানির সংকটাপন্ন প্রত্যেক গ্রামে খাবার পানি সরবরাহের জন্য কমপক্ষে সরকারীভাবে একটি পুকুর খনন করতে হবে।

৪) দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল অঞ্চলে বিরাজমান সুপেয় পানি সংকট নিরসন করে সকলের জন্য লোনামুক্ত সুপেয় খাবার পানি প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে।

৫) মিষ্টিপানির উৎসগুলো যেন বিনষ্ট না হয় সেদিকে খেয়াল রেখে চিংড়ি ও অন্যান্য নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

৬) কৃষি ও গৃহস্থালী কাজের জন্য মিষ্টিপানির প্রবাহ ও সরবরাহ বৃদ্ধি করতে হবে।

৭) জলাবদ্ধতা, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং চিংড়ি চাষের ফলে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের নূতন নূতন এলাকা লবণাক্ততায় আক্রান্ত হচ্ছে। এ সমস্যা সমাধানে সরকারীভাবে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৮) জাতীয় পানি নীতি ও জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ও অনন্য-সাধারণ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত নেই। এ দুটি দলিলেই এ অঞ্চলের স্বতন্ত্র প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৯) দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের যে সকল নদী ও খাল ভরাট হয়ে গেছে সেগুলো পুনঃখনন করতে হবে।

১০) মিষ্টিপানির মরা নদী ও জলাধারগুলোকে চিংড়ি চাষ ও অবৈধ দখলমুক্ত করে শুধুমাত্র খাবার পানির জন্য ব্যবহার করতে হবে।

১০. উপসংহার

গঙ্গা নদীর গতিমুখ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এ অঞ্চলে মিষ্টিপানির যে দুষ্প্রাপ্যতা সৃষ্টি হয়, মাথাভাঙ্গা নদীর উৎসমুখ বন্ধ হয়ে গিয়ে তা আরো তীব্র হয়ে ওঠে। ষাট-এর দশকে নির্মিত উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প, লবণপানির চিংড়ি চাষ এবং সাম্প্রতিক সময়ে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি সুপেয় পানির সমস্যাকে ক্রমান্বয়ে মহাসংকটের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। উল্লেখ্য ১৯৭৪ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যেখানে ৮৬ শতাংশ সেখানে এ উপকূল অঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার মাত্র ৫৯ শতাংশ। কর্মসংস্থানের অভাব প্রচলিত কৃষি ব্যবস্থার বিপর্যয় এবং জীবন ধারণের জন্য সুপেয় পানির অভাব ইত্যাদি কারণে দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল অঞ্চল ক্রমান্বয়ে মনুষ্যবাসের অনুপযোগী হয়ে উঠছে। এ অঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির এ নিম্ন হার তারই সাক্ষ্য বহন করে।

বাংলাদেশ সরকার জোহানবার্গ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এবং Millennium Development Goal কে সামনে রেখে সুপেয় পানি সরবরাহের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য জাতীয় পানি নীতি ও জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় জলবায়ু পরিবর্তন ও লবণাক্ত এলাকা সম্প্রসারণের প্রেক্ষিতে সৃষ্ট দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল অঞ্চলের খাবার পানি সংকট ইস্যুকে সংযুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার করার পূর্বে সরকারকে অবশ্যই এ ইস্যুটি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য গুরুত্ব সহকারে পুনর্বিবেচনা করতে হবে।

পানির অপর নাম জীবন। জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য সুপেয় পানি পাওয়া মানুষের মৌলিক নাগরিক অধিকার। আর নাগরিকদের এ অধিকার প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব একান্তভাবে রাষ্ট্রের। তাই অন্যান্য সমস্যার পাশাপাশি এ অঞ্চলের সুপেয় পানির সমস্যা মোকাবেলায় জন্য দরকার আরও জোরালো সরকারী পদক্ষেপ। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী সংস্থাসহ সকল পর্যায়ের নাগরিকদের এ ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা প্রয়োজন। প্রয়োজন জনসচেতনতা বৃদ্ধি, সুপেয় পানির নূতন নূতন উৎস অনুসন্ধান করা এবং জনগণের সমস্যা সমাধানে তা ব্যবহার করা।